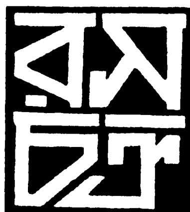
মনের গহনে

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

১৪২২



প্রকাশক—শ্রীভবভূতি রায়
রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্
৯এ, সাহানগর রোড
টালীগঞ্জ, কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৪৩

-দাম দেড়টাকা—

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী

করকমলেষু—

মনের গহনে ১৪২২

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণাংশে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এদিকে কেবল মাঠের পর মাঠ, ধান-জমি। মাঝে মাঝে তাল ও আমের বাগান। তাও মাঠের মধ্যে নয়, গ্রামের কোলে। কোথাও জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই। শীতকাল। ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। শুধু মাঝে মাঝে আখের ক্ষেত মাঠের শূন্যতা দূর করিতেছে। এদিকে বাঘ আসার কথা নয়। আসেও না। কেবল ক্ষেতের আখগুলিকে ছেলেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে লোকে গুজব তোলে, অমুক মাঠে বাঘ আসিয়াছে। এমন একটা গুজবের মুখে সেবারে একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

তাঁতীপাড়ার কয়েকটি ছোকরা পাড়ার কয়েকটি খেজুর গাছে রস লাগায়। গুড় তৈরী করিবার মতো প্রচুর রস এদিকে হয় না। শুধু নিজেদের ঊষাপান, পাঁচজনের মধ্যে বিতরণ এবং খানিকটা আমোদ—এই লাভ। কিন্তু তাহার জন্য কম কষ্টও করিতে হয় না। রাত্রে লোকে আসিয়া রস খাইয়া চলিয়া যায়। সকালে ইহারা গিয়া দেখে ভাণ্ডে রস নাই। সেজন্য প্রায়ই রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতেও হয়। এই কয়দিন কেবল পাহারা দিতে হইতেছে না। বাঘের ভয়ে কেহ আর রাত্রে বাহির হইতে সাহস করে না।

খুব ভোরে। আর রাত নাই, কিন্তু ভোর হইতেও বিলম্ব আছে। তাঁতীপাড়ার ছোকরা কয়টি বেশ করিয়া কাপড় মুড়ি দিয়া

মনের গহনে

থুর থুর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একজন থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কি!

ছোকরা কথা কহিল না, শুধু আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল,—পথের ধূলায় স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ! একটি, দুটি, তিনটি, অনেকগুলি ব্যাঘ্র-পদচিহ্ন বাঁ দিকের ডোবার পথ ধরিয়া গিয়াছে। ওইখানেই একটা খেজুর গাছে রস লাগানো হইয়াছে যে!

সর্ব্বনাশ!

—আর রসে কাজ নেই, ভাই। চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

—যা রে যা! গিয়ে পরিবারের আঁচল ধরে বসে থাক গে। বাঘ না ইয়ে!

—কিন্তু কত বড় থাবা দেখেছিস?

—দেখিছি। আমাদের বাঘা কুকুরটার থাবা ওর চেয়ে বড়।

বলিতেছিল বটে, কিন্তু সকলেরই কণ্ঠস্বর নামিয়া গিয়াছে। বাঘ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। বাঘা কুকুরটার পায়ের দাগ হওয়াও অসম্ভব নয়। সেটাও প্রকাণ্ড বড় কুকুর। দেশী জাতের অত বড় কুকুর প্রায় দেখা যায় না।

অকস্মাৎ দূরে নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিল,—ওরে বাঘরে বাঘ, বাঘ!

এক সেকেণ্ডে সকল তর্কের অবসান হইল। হাতের ভাঁড়

ঢুম্ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, সকলে একলাফে পাশের প্রাচীর টার উপর উঠিল। নীচে মাটির ভাণ্ড ভাঙিয়া রস গড়াইয়া পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। আর উপরে তাঁতীপাড়ার ছোকরা কয়টি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রাচীরটি মোড়লদের খামারবাড়ীর। এক প্রান্তে তাহাদের গোয়ালঘর, আর প্রান্তে রান্নাঘর। ভয়ের আধিক্যে তাহারা দেখিতে পায় নাই, প্রাচীরের ঠিক নীচেই মোড়লদের বাড়ীর ছোট বৌটি গোবর মাখিতেছিল। অতগুলি লোক দুমদাম্ করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিতেই সে ভয় পাইয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া শাশুড়ীকে খবর দিল।

শাশুড়ী বাড়ীর ভিতরে উঠান ঝাঁট দিতেছিল। ঝাঁটা হাতেই বাহিরে আসিয়া কাংস্যকণ্ঠে হাঁকিল,—কে রে মুখপোড়া! মরবার আর জায়গা পাস নি? আমার বাড়ীতে এসেছিস উপদ্রুপ ক'রতে?

মুখপোড়ারা একদল তখন সরিতে সরিতে গোয়ালঘরের কাছে পৌঁছিয়াছে, আর একদল রান্নাঘরের কাছে।

বুড়া চীৎকার করিতেই তাহারা ধমকাইয়া কহিল,—চুপ! বাঘ!

—বাঘ! দিনের বেলায় বাঘ! আমাকে ছোট ছেলে পেয়েছিস, না রে? নাম ব'লছি।

মনের গহনে

প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ তো এক লাফেই সব কয়টাকে সাবাড় করিয়া দিবে। তাহারা সকলেই চালের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু শিশিরে খড়ের চাল এমন পিছল হইয়া উঠিয়াছে যে, উঠিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে। আর সেই সময়েই বুড়ী টিস্‌টিস্‌ আরম্ভ করিয়াছে।

—আরে, এ মাগী করে কি? ব'লছি, বাঘ…!

—বাঘ বার করছি দাঁড়া রে মড়া! ডাকি লসনাকে, সে এসে দেবে তোদের মুখে নুড়ো জেলে। ওঠ তো রে লসনা, মড়ারা এসেছে সকাল বেলায় আমার বাড়ীতে বাঘ দেখাতে!

মাতার বারম্বার আহ্বানে লসন চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। দাওয়ায় দাঁড়াইয়া তাহার নজর পড়িল সম্মুখে রান্নাঘরের চালের উপর কয়েকটি লোক ঘেঁসাঘেঁষি বসিয়া আছে, আর সভয়ে বারবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে।

—কী হে পেল্লাদ!

প্রহ্লাদ একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিল না। যেমন অবস্থায় বসিয়া ছিল, তেমনি অবস্থায় শুধু অস্ফুট স্বরে কহিল,—বাঘ!

বাঘের গুজব কয়দিন হইতেই উঠিতেছিল। লসন সভয়ে কহিল—কোথায় হে?

প্রহ্লাদ সাড়া দিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

লসন আবার উচ্চতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় পেল্লাদ ?

ভয়ের সময় বেশী কথা কহিতে বিরক্ত লাগে। প্রহ্লাদ ঝাঁঝিয়া কহিল,—কোথায় তা কি দেখতে পাচ্ছি না কি ? এই খানেই আছে কোথাও।

পরক্ষণেই কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল। কি বলিল বোঝা গেল না। কিন্তু আওয়াজটা অত্যন্ত কাছেই মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন কর্কশ কণ্ঠে পাড়া মাতাইয়া চীৎকার করিল—পালারে বাঘ, বাঘ !

এবং তাহার চীৎকার বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে কি যেন একটা ভারী জন্তু যে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া লসন ব্যাঘ্রের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল, সেই ঘরের চালের উপর ধুম্ করিয়া লাফাইয়া পড়িল, বোধ করি পাশের তেঁতুল গাছটা হইতে।

বাঘ !

চক্ষের নিমেষে লসন ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া খিল লাগাইয়া দিল। তাহার স্ত্রী দাওয়ার এক কোণে অন্তরালে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেও কালবিলম্ব না করিয়া পাশের ঘরে খিল লাগাইয়া দিল। কেবল লসনের বৃদ্ধা জননী ছুটিয়া দাওয়ায় উঠিতে গিয়া সিঁড়িতে হোঁচট খাইয়া আবার উঠানেই গড়াইয়া পড়িল এবং

হাত-পা ছুঁড়িয়া জড়িত কণ্ঠে এমন ভাবে কাৎরাইতে লাগিল যে, শুনিলে মনে হয়, বাঘটা তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

আর গোয়াল ও রান্নাঘরের উপরেব লোকেরা প্রাণপণে চালের খড় আঁকড়াইয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে বড় ঘরের চালের উপর যে জন্তুটা লাফাইয়া পড়িয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে তখন থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে। রান্নাঘরের উপর হইতে প্রহ্লাদের দল স্পষ্ট দেখিতেছে, সেটা সত্যই বাঘ নয়, একটা হনূমান মাত্র। কিন্তু তথাপি যেন কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া স্খলিত কণ্ঠে কেবলই চীৎকার করিতেছে,—বাঘরে, বাঘ, বাঘ!

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। মেয়েরা স্নান, ঘরের কাজ, রান্নাবান্না বন্ধ করিয়া রুদ্ধ ঘরে ছেলেপুলে লইয়া বসিয়া রহিল। ঘাটে যাওয়ারও উপায় নাই, ঘরের বাহিরে আসিবারও উপায় নাই! বাঘটা যে কোনো মুহূর্ত্তে যে কোন স্থান হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। অথচ মুস্কিলের কথা এই যে, বাঘটা যে ঠিক কোথায় আছে তাহাও ঠাহর করিবার উপায় নাই। এই দক্ষিণপাড়া হইতে চীৎকার আসিল, বাঘ, বাঘ। পরক্ষণেই পূর্ব্বপাড়া হইতে তেমনি চীৎকার আসিল। কোথাও খুট্ করিয়া একটা শব্দ হইতেছে কি লোকে ভয়ে বাঘ, বাঘ, বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

মনের গহনে

গ্রামের চৌকিদার পরাণ হাজরার বয়স হইয়াছে। তবু এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিজের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিঃশব্দে তামাক টানিতেছিল। ঘরে তাহার দরজা নাই, রাত্রে একটা ঝাঁপ বন্ধ করিয়া থাকে। তাহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে বসিয়া এতক্ষণ ধরিয়া পরাণকে ঘরে আসিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছিল। সে ঘরে না আসিলে বেচারা ঝাঁপ বন্ধ করিতে পারিতেছিল না। আবার ঝাঁপ বন্ধ না করাও নিরাপদ নয়।

—মিন্‌সে নিজেও মরবে, সাতগুষ্ঠিকেও মারবে। ঘরে আসবি তো আয়, নইলে দিলাম ঝাঁপ বন্ধ ক'রে।

এবারে পরাণ ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল,—দে ক্যানে ঝাঁপ বন্ধ ক'রে! মানা ক'রছে কে?

তাহার স্ত্রী মুখ ভেঙ্‌চাইয়া বলিল,—মানা ক'রছে কে? একটা মানুষ ঘরের বাইরে ব'সে থাকলে ঝাঁপ দেওয়া যায়?

—তবে মর্।

বলিয়া পরাণ বিরক্ত ভাবে হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘরের এক কোণ হইতে একটা বড় টাঙি এবং তাহার চৌকিদারী পেটিটা বাহির করিয়া উঠানে নামিল।

—আবার টাঙি নিয়ে চললি কোন্ চুলোয়?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পরাণ বাহির হইতে হইতে শুধু বলিয়া গেল,—দে এইবার ঝাপ বন্ধ ক'রে।

তাহার পরিবার হাউ মাউ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। সুমুখেই বৈঠকখানায় একটা মোড়ার উপর বসিয়া রায়েদের বড় বাবু পাটের দড়ি কাটিতেছিলেন। পরাণ উঠান হইতেই গড় হইয়া তাঁহাকে প্রাতঃপ্রণাম করিল।

বড় বাবু বিপুল শক্তি ও অসীম সাহসের জন্য বিখ্যাত। বয়স ষাটের কাছে পৌছিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি হুঙ্কার দিলে বড় বড় জোয়ানেরও বুক কাঁপিয়া ওঠে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সম্মুখে লাঠি ধরে, এমন লোক এ অঞ্চলে বেশী নাই।

তিনি পরাণের দিকে বঙ্কিম নেত্রে একবার চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এদিকে চল্‌লি কোথারে হারামজাদা? বাঘ এসেছে যে।

পরাণ করযোড়ে নিবেদন করিল,—আজ্ঞে তাই শুনেই একবার বেরুলাম বাবু। মাগীকে বললাম, তুই ঝাঁপ দিয়ে ছেলেগুলোকে নিয়ে বোস, আমি বাঘের খপরটা একবার নিয়ে আসি।

বড় বাবু হাসিয়া বলিলেন—তাই যা। মাগীর হাতে শ্মশান খরচটা রেখে এসেছিস তো?

পরাণ একগাল হাসিয়া কোমরের পেটিটার উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। কহিল,—আজ্ঞে আমরা মহারাণীর চাকর, আমাদের ওপর তো তেনার হস্ত উঠবে না।

এমন সময়ে কাছেই বহু কণ্ঠের সম্মিলিত কলরব উঠিল,—এই যে, এই যে! মার, মার।

মনে হইল মুখুয্যেদের খামারবাড়ীতে।

বড় বাবু ডান হাত দিয়া মেঝে হইতে কাস্তেটা উঠাইয়া লইয়া মোড়াটিকে একেবারে দরজার গোড়ায় টানিয়া আনিলেন। যেন প্রয়োজন বোধ করিলে, এক লম্ফে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন।

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন অথচ বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন,—তা, সংবাদ নিতে হয় তো যা। নইলে ঘরের মধ্যে ঢোক্! বাঘটা মনে হচ্ছে মুখুয্যেদের খামারবাড়ীতে ঢুকেছে।

পরাণ বাঁ হাতটা একবার পেটিতে একবার কপালে ঠেকাইয়া টাঙ্গিটা কাঁধে ফেলিয়া কহিল,—আজ্ঞে না, ঘরে আর প্রবেশ ক'রব না, খপরটাই নিয়ে আসি।

বলিয়া মুখুয্যেদের খামারের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

বড় বাবু উদ্বিগ্ন মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এখান হইতে মুখুয্যেদের খামারবাড়ী মিনিট তিনেকের পথ। একাকী, এত কাছে একখানি মাত্র কাস্তে সম্বল করিয়া বসিয়া থাকা নিরাপদ হইবে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এক কালে তাঁহার নিজের বন্দুক ছিল, শিকারের সখও ছিল। পরিণত বয়সেও তিনি নিজের হাতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। তাই বাঘ যে কত হিংস্র

তাহাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু কিছুদিন হইল কোন অজ্ঞাত কারণে সরকার তাঁহার বন্দুক, এমন কি, বহুকষ্টে সংগৃহীত কয়েকখানি গুপ্তি এবং তরবারিও বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত অস্ত্র না লইয়া বাঘের সম্মুখীন হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই বলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া ছিলেন। অথচ, ছাড়া বাঘ দেখিবার সখটুকুও ষোলো আনা আছে! এত কাছে বাঘ আসিয়া পড়ায় তিনি ভাবিতেছিলেন, এখানে বসিয়া থাকা সঙ্গত হইবে কি না।

এমন সময় পাঁচু সেখ আসিয়া অভিবাদন করিল,—সেলাম বাবু।

লোকটা উৎসাহের আধিক্যে একবারে শুধু হাতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

—কি হে সেখজি?

—জি, আপনাদের পাড়ায় নাকি বাঘ আল্‌ছে?

—আল্‌ছে। তাই শুধু হাতে নেমন্তন্ন রক্ষা ক'র্‌তে এসেছিস্?

পাঁচু এক গাল হাসিয়া কহিল,—জি, আমরা জাত পাঠান। একটা নেংটে বাঘ মারতে আমাদের হাতিয়ার লাগে না। ধরব, কি কল্লা মুচুড়ে লুব।

দাঁত খিঁচাইয়া বড় বাবু বলিলেন,—ভারি মরদ!

পাঁচু সেইখানেই সিঁড়ির উপর বসিয়া মেঝেয় একটা চাপড় দিয়া

কহিল,—জি, পাঁচু সেখের মর্দ্দানি সেবার বিলের লড়ায়ে তো দেখলেন। পঁচিশটা জোয়ান আমি একা ভাগিয়েছি।

পাঁচু ক্ষুন্ন হইয়াছে দেখিয়া বড় বাবু হাসিয়া বলিলেন,—ওরে হতভাগা, এ তোর লেঠেলি নয়। বাঘ লাঠি মানে না।

পাঁচু লাঠিয়ালি ঢঙে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—কোন খানে বাঘটা আছে বলুন। পাঁচু সেখের কেরামতি আর একবার হুজুরকে দেখিয়ে দিই।

পাঁচু বড় বাবুর পেয়ারের লাঠিয়াল। নিজের হাতে তাহাকে লাঠি খেলা শিখাইয়াছেন। তাঁহার বহু দুঃসাহসের বিশ্বস্ত সঙ্গী সে। তাহাকে বাঘের মুখে পাঠাইতে মন সরিতেছিল না। কিন্তু সে যে এ ব্যাপারে নিষেধ মানিবে না, তাহাও বুঝিলেন।

একটু দ্বিধার সঙ্গে বলিলেন, যাবি? তা যা। বোধ করি মুখুয্যেদের খামারেই আছে। তবে শুধু হাতে যাস নে। এই কাস্তেখানা নিয়ে যা।

পাঁচু ওস্তাদের দেওয়া কাস্তেখানি পরম সমাদরে মাথায় ঠেকাইল।

বড় বাবু আবার বলিলেন, দেখিস্, যার তার ঘাড়ে বসাস না যেন। ওতে বিষ পান দেওয়া আছে। রক্ত বার হলে আর নিস্তার নাই।

পাঁচুর উল্লাস দেখে কে! কাস্তেখানা ভালো করিয়া পরীক্ষা

করিয়া পাঁচু বলিল, জি, তা হলে ও শালার মিত্যু নিঘ্যাৎ আমার হাতে।

বলিয়া পাঁচু ওস্তাদকে আর একবার সেলাম করিয়া কাস্তেখানা উর্দ্ধে তুলিয়া লাঠিয়ালি ঢঙে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

তাঁতীপাড়ার ছেলেগুলি ঠিক দেখিয়াছিল।

বাঘের পায়ের থাবাই বটে। অনুমান হইতেছে বাঘটি সেই দিক দিয়া সোজা চাটুয্যেদের কলাবাগানে ঢোকে। চাটুয্যেদের কলাবাগান তাহাদের অন্দরেরই এক প্রান্তে। চাটুয্যেগিন্নী সেদিকে গোবরছড়া দিতে গিয়া দেখিতে পান, বাঘটি সুমুখের দুই থাবায় মুখ ঢাকিয়া ঝোপের মধ্যে সম্ভবত নিদ্রা যাইতেছে। তিনি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রাণপণে বাঘ, বাঘ, বলিয়া চীৎকার জুড়িয়া দেন। সে চীৎকারে পাড়ার লোক উঠিয়া পড়ে। যাহারা সাহসী তাহারা ছুটিয়া বাহিরে আসে। কিন্তু এরূপ সাহসী লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। অধিকাংশ লোকই নিরাপদ গৃহকোণে বসিয়া বলিতে থাকে—বাঘ না আরও কিছু! দেখেছে হয়ত উদ্‌বেড়াল, অমনি ভয়ে ভিরমি খেয়েছে। তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন?

তথাপি পাড়ায় একটা সোরগোল ওঠে। এবং সে চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গজনিত বিরক্তিতে গাত্রোত্থান করিয়া, ব্যাঘ্র মহাশয়

মনের গহনে

পদ্মগড়ের দক্ষিণ এবং বন্দীগড়ের উত্তর দিয়া সোজা পশ্চিম মুখে হাঁটিতে থাকে। বন্দীগড়ের ঘাটে দত্তদের সেজ বৌ বাসন মাজিতেছিল। সে বাসন লইয়া একরূপ বাঘের সুমুখ দিয়াই বাড়ী ঢোকে। বাঘ হয়তো তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, নয় তো অন্য কোন খেয়ালে ছিল, অবলা মানবীকে আক্রমণ করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। দত্তদের সেজ বৌও অতটা খেয়াল করে নাই। করিলে সেইখানেই মূর্চ্ছা যাইত।

বলে,—দেখলাম যেন মা, কি একটা পদ্মগড়ের পাশ দিয়ে এই দিকেই হেলে-দুলে আসছে। কে জানে মা, বাঘ! আমি তো সুমুখ দিয়েই চ'লে এলাম।

বলে আর তাহার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া ওঠে।

দত্তদের সেজ ছেলে তখনও লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল। এই শীতের রাত্রে এত ভোরে উঠিয়া স্ত্রী যে বাসন মাজিতে যায়, তাহা তাহার ভালে লাগো না।

মুখের উপর হইতে লেপটা সরাইয়া তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল,—উঃ! রাত পোয়াতে না পোয়াতে নিত্যি নিত্যি বাসন মাজার ধুম প'ড়ে যায়! নিত মাগীকে গপাং ক'রে তো বেশ হ'ত!

মাগী সভয়ে শিহরিয়া বলিল,—বাবাঃ! এত বড় মাথাটা। আমি তখনি জানি, উনি সহজ পেরানী লয়।

—উঃ! তুইত সবই জানিস। নিত্যি বলি অত ভোরে যাস

না, গাঁয়ে বাঘ এসেছে। আমার কথা গেরাহ্যিই হয় না। এইবার যা।

—আবার !

বলিয়া সেজ বৌ স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিল।

এখান হইতে বাঘ বরাবর গিয়া মুখুয্যেদের খামারে ঢোকে। শীতকাল। খামারে সারি সারি অনেকগুলি ধানের পালা। পাশা-পাশি তুইটি পালার মধ্যে যে সরু ফাঁক আছে, সেই স্থান দিনযাপনের পক্ষে নিরাপদ হইবে মনে করিয়া বাঘটা তাহারই মধ্যে আশ্রয় লয়। লোকে আর বাঘ খুঁজিয়া পায় না। শেষে মুখুয্যেদের রাখাল আসিয়া সংবাদ দেয়, বাঘ তাহার মনিবের খড়ের পালার ফাঁকে আশ্রয় লইয়াছে। খামার পরিষ্কার করিতে আসিয়া সে ছোকরা দেখিতে পায়, বাঘের লেজের কিয়দংশ বাহিরে থাকিয়া থাকিয়া লট্‌পট্‌ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বহুলোক খামারবাড়ীর চারিদিকের বাড়ী-গুলির চালের উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্তু বেলা বাড়ে, তবু বাঘের বহিরাগমনের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। লোকে চালের উপর বসিয়া বসিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এমন কি, কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিল যে, এত সোরগোলের পরও যখন জন্তুটা বাহিরে আসে না, তখন ওটা নিশ্চয় বাঘ নয়, উদ্‌বেড়াল কিম্বা অমনি একটা কিছু হইবে।

মনের গহনে

অবশেষে সরকারদের ওরম্বাপদ সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া লাফ দিয়া খামারবাড়ীর মধ্যে পড়িল। ওরম্বা দেখিতে বেঁটে-খাটো, কিন্তু গায়ে অসীম জোর—প্রশস্ত বুক, সুদৃঢ় পেশীবহুল বাহু এবং সাহসও যথেষ্ট। ছোকরা গায়ে ডজন্ খানেক জামা চড়াইয়া, বুকে-মাথায় বেশ করিয়া কম্ফার্টার জড়াইয়া আসিয়াছে। বিশ্বাস, বাঘে তাহার কিছু করিতে পারিবে না।

ওরম্বা অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, লেজটি বাঘেরই কিনা। বাঘ সে কখনও দেখে নাই। বড়বাবুর বাড়ীতে কতকগুলো বাঘের চামড়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের লেজ কি রকম ছিল ঠিক মনে পড়িল না। তবু তাহার মন বলিল, এ লেজ বাঘের না হইয়া যায় না।

উপর হইতে তখন ক্রমাগত প্রশ্ন আসিতেছে,—বাঘ বটে ত হে? না উদ্‌বেড়াল?

সাড়া দিবার উপায় নাই। ওরম্বা ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে লাগিল, বাঘই বটে।

শুনিয়া লোকগুলা চালের উপর বেশ সাবধান হইয়া বসিল।

ওরম্বার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। যদি আস্তে আস্তে খড় চাপা দিয়া ফাঁকটুকু বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাঘটার নিশ্চয়ই পলাইবার পথ বন্ধ হইবে। তখন তাহাকে কায়দা করা সহজ হইবে। আগুন লাগাইয়াই হউক, আর সকলে

মিলিয়া চাপ দিয়াই হউক, বাঘটাকে মারিয়া ফেলিতে কষ্ট হইবে না।

এইরূপ সংকল্প করিয়া ওরম্বা বাঘের লেজের দিকে আঁটি আঁটি খড় চাপা দিতে লাগিল। পিছনের ফাঁকটা কেবল বন্ধ হইয়াছে, অকস্মাৎ একটা ভীষণ গর্জ্জন উঠিল। তেমন গর্জ্জন এ অঞ্চলের লোকে জীবনে শোনে নাই। চালের উপরের লোকগুলি পড়িতে পড়িতে কোনরূপে চালের খড় ধরিয়া বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাদের কাঁপুনি আর থামে না।

ভীষণ গর্জ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরম্বা লক্ষ্য করিল বাঘটা দুই পা তুলিয়া সোজা হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। প্রকাণ্ড মাথা, তাহাতে চোখ দুইটা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, আর হাঁ-মুখটা এতই বড় যে ওরম্বার কম্ফার্টার সমেত মাথাটা অবলীলাক্রমে তাহার ভিতর চলিয়া যাইতে পারে।

পলকের মধ্যে ওরম্বার চক্ষুর সম্মুখ হইতে খড়ের পালা, ঘরের দেওয়াল, আকাশ, মাটি, গাছপালা লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। তাহার সমস্ত বাহ্যচৈতন্য লোপ পাইল। কিন্তু ভগবান মানুষের মনে আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রেরণা দিয়াছেন, বোধকরি সেই প্রেরণার বশেই সে বাঘের উর্দ্ধোত্থিত সমুখের দুইটা পা প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিল।

তারপর আরম্ভ হইল, মানুষে বাঘে লড়াই।

ওরম্বার দেহে অমিত শক্তি। বাঘটা তাহার দৃঢ়মুষ্টি হইতে স্মুখের পা দুইটা ছাড়াইয়া লইতে পারিতেছে না। কিন্তু এমন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে যে, আর বোধ হয় বেশীক্ষণ সে-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি ওরম্বার থাকিবে না। তাহার পিঠ একটা খড়ের পালায় না ঠেকিলে এতক্ষণ বোধ হয় সে পড়িয়া যাইত। পিছনের পা দিয়া বাঘটা তাহার পায়ের হাঁটু হইতে নীচে পর্য্যন্ত কয়েকটা স্থান চিরিয়া দিয়াছে। ক্ষতমুখ দিয়া ঝর ঝর ধারে রক্ত পড়িতেছে। ওরম্বা বাঘের স্মুখের পা দুইটা ধরিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ফারিত চোখে সে যে কি দেখিতেছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এক মিনিট······দুই মিনিট······!

এমন সময় চৌকিদার পরাণ হালদার আসিয়া টাঙি দিয়া বাঘের পিঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া বলিল,—হেট্, হেট্।

যেন তাহার দুষ্টু হাঁসা বলদটা গলাঙ্কি খুলিয়া খামারে ঢুকিয়াছে, ধান খাইতে!

বাঘটা এক মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর এক ঝট্কায় ওরম্বার মুষ্টি হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া পরাণের উপর লাফাইয়া পড়িল—এবং সরকারী পেটির মর্য্যাদা কিছুমাত্র রক্ষা না করিয়া মহারাণীর ভৃত্যের ঠোঁটের দক্ষিণ পাশ হইতে গালের খানিকটা মাংস উঠাইয়া লইয়া, এক লাফে খামার

বাড়ীর অনুচ্চ প্রাচীর ডিঙাইয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সেটা বড় রাস্তা নয়। ডান দিকে মুখুয্যেদের বাড়ী, তারপরে মহান্তদের গোলাবাড়ী, তারপরেই একটা ছোট ডোবা। সেখান হইতে একটা ছোট রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামসীমান্তে হাড়ীপাড়ায় পৌছিয়াছে, আর একটা বাঁয়ে বেঁকিয়া রায়েদের বৈঠকখানার পাশ দিয়া তাঁতীপাড়ার দিকে গিয়াছে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পাঁচু সেখ ডোবাটা পার হইয়া মহান্তদের গোয়ালবাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত লাফাইতে লাফাইতে গিয়াছে। কাস্তে-খানা তখনও তাহার ডান হাতে তেমনি শূন্যে নাচিতেছে।

এমন সময় চারি চক্ষে সম্মেলন!

সঙ্গে সঙ্গে জাত-পাঠানের মুখ শুকাইয়া গেল। কে জানিত বাঘের চোখ এমনি করিয়া জ্বল্ জ্বল্ করে! বাঘটা তাড়াইয়া আসিতেই, সে কাস্তেখানা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়াই ডোবায় লাফ দিল,—সেখানে বাঘের গায়ে লাগিল কিনা, অথবা লাগিলেও ফল হইল কিনা, পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলও না। কেবল অনুমানে বুঝিল ঠিক তাহার পিছনে পিছনে আরও একটা কি যেন জলে লাফ দিয়া পড়িল।

পাঁচু সেখ ডুব-সাঁতার কাটিয়া ও-পারে গিয়া উঠিল, এবং দুরন্ত শীতে ভিজা কাপড়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতেই

ওপাশের পদ্মগ'ড়েতে আবার লাফ দিয়া পড়িল।

বাঘটা খানিক জলে সাঁতরা-সাঁতরি করিয়া আবার এ-পারেই উঠিয়া আসিল, এবং মহান্তদের গোয়ালঘর ও মুখুয্যেদের বাড়ীর মধ্যে যে সরু গলি আছে সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল বড় বড় বাবরী চুলওয়ালা কে একজন একটা রাম-দা হাতে করিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। বাঘটা ইচ্ছা করিলে এক নিমেষে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু সে কিছুই করিল না। শুধু সুমুখের বড় বড় ঝকঝকে দাঁত দুইটা বাহির করিয়া শব্দ করিল,—গাঁ্যাও-ও।

ব্যস। আর দেখিতে হইল না। বাবরীওয়ালা লোকটি ছিট্‌কাইয়া প্রথমে মহান্তদের গোয়ালঘরের দেওয়ালে পড়িল, সেখান হইতে আছড়াইয়া পড়িল মুখুয্যেদের ঘরের দেওয়ালে। দুইটা গাল এবং হাঁটুর চামড়া খানিকটা উঠিয়া রক্তাক্ত হইয়া গেল; কিন্তু তখনও তাহার থামিবার উপায় নাই। লোকটা গড়াইতে গড়াইতে ডোবার জলে গিয়া পড়িল।

বাঘ কিন্তু আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। হেলিয়া দুলিয়া মৃদুমন্দ গতিতে মহান্তদের গোয়ালঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোয়ালের এক কোণে গুটি তিনেক গরু বাঁধা ছিল। বাঘ দেখিয়া সেগুলা তখন কোণে ঘেঁষাঘেষি করিয়া দড়ি ছিঁড়িবার ব্যর্থ

চেষ্টা করিতে লাগিল। গোকুল মহান্ত খবরটা শুনিয়া রুদ্ধ শয়ন-কক্ষের মধ্যে বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল,—গেল রে, গেল গেল, হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল। বাঘটা এতক্ষণে গরুগুলিকে বুঝি সাবাড় করিয়া ফেলিল।

কিন্তু ডোবার জল হইতে উঠিবার পর হইতে বাঘটা যেন মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। গরুগুলির হাম্বারব এবং ছুটোপাটিতেও তাহার জলযোগের স্পৃহা দেখা গেল না। সে আর এক কোণে স্থির হইয়া বসিয়া প্রসারিত জিহ্বা দিয়া পদতল লেহন করিতে লাগিল।

অনেকগুলি লোক সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালঘরের চালের উপর উঠিয়া পড়িল। একজন বুদ্ধি করিয়া চালের খড় খানিকটা ফাঁক করিয়া, সেই পথে একখানা কাস্তে-বাঁধা বাঁশের লগি দিয়া গরুগুলির গলার দড়ি কাটিয়া দিল। ছাড়া পাইয়া গরুগুলি যে লাফ দিয়া কোন্ দিকে পলাইল, তাহা আর দেখা গেল না।

বাঘ শুইয়া শুইয়া অপাঙ্গে চাহিয়া সব দেখিল। কিন্তু একটা গরুও ধরিবার চেষ্টা করিল না। সেই অবস্থায় শুইয়া শুইয়া হাঁফাইতে লাগিল।

এইবারে বাঘটাকে বন্দী করা যায় কি করিয়া? গোয়ালঘরের শিকল সাধারণতঃ আল্‌গাই হয়। কিন্তু নামিয়া গিয়া শিকল লাগাইবে কে? আবার কয়েকজন লোক সেইখানকার চালের

খানিকটা অংশের খড় সরাইয়া ফেলিল এবং বারকয়েক চেষ্টা করার পর সেই কাস্তে-বাঁধা লগিটা দিয়া অবশেষে শিকল তুলিয়া দিতে সক্ষম হইল। প্রথমে উপর হইতেই বেশ ভালো করিয়া দেখা হইল শিকল ঠিক লাগিয়াছে কি না। কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, শেষে একজন সাহসী ব্যক্তি নামিয়া আসিয়া, তাহার উপর একটা ভারী তালা বেশ শক্ত করিয়া লাগাইয়া দিল।

এত বড় সাফল্যে চালের উপর মহোৎসব লাগিয়া গেল। কতকগুলা ছোকরা চালের মট্‌কার প্রায় সমস্তটারই খড় উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল।

সে খবর শুনিয়া গোকুল মহান্ত আবার চীৎকার করিতে লাগিল, ওরে বাবারে, ছোঁড়ারা মিলিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিল রে। একে তাহার খড় নাই। খড়ের অভাবে বহু কাল গোয়াল-ঘর সংস্কার করিতে পারে নাই। তাহার উপর যে সামান্য আচ্ছাদন ছিল, তাহাও পাঁচ শয়তানের পাল্লায় পড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

গোকুল শাসাইতে লাগিল, নষ্টামি দেখিয়া দেখিয়া তাহার চুল পাকিয়া গেল। সে আর নষ্টামি বোঝে না? ও সব বাঘ-মারা তো নয়, তাহার সর্ব্বনাশ করা। একবার কাছারী খুলুক, তারপর সে সকলের নামে এক এক নম্বর ঠুকিয়া খেসারত আদায় করিয়া ছাড়িবে, তবে তাহার নাম গোকুলচন্দ্র দাস মহান্ত।

কিন্তু গোকুলের কণ্ঠ রুদ্ধগৃহের বাহিরে এতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে-ছিল না। পৌঁছিলে তাহাতে কর্ণপাত করিবার মতো মনের অবস্থাও কাহারও ছিল না। তাহারা উপর হইতে বাঘের উপর বড় বড় ইঁট, পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। তাহাতে অবশেষে বাঘ যেন অত্যন্ত বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চালের উপরকার লোকদের প্রতি একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঘরের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। লোকে মাঝে মাঝে বর্শা ছুঁড়িয়া মারে। কোনোটা গায়ে আসিয়া টপ্ করিয়া পড়ে, কোনোটা মেঝেয় বিঁধিয়া যায়। বাঘটা মাঝে মাঝে লাফ দিবার ভয় দেখায়। কিন্তু লাফ দিয়া তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না জানিয়াও লোকেরা ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। তাড়াতাড়িতে পরস্পরের মাথায় মাথা ঠুকিয়া যায়, মাথা ফুলিয়া ওঠে।

অবশেষে স্থির হইল, এমন করিয়া কিছুই হইবে না। গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র লোকের কাছে বন্দুক আছে। তাহাকেই ডাকিয়া আনা হউক। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিল কাশী হালদারের বাড়ী। হালদার বাড়ীতেই ছিল। অনেক ডাকাডাকির পর তাহার বড় ছেলে আসিয়া বলিল,—বাবা মাথার অসুখে শয্যাগত।

—তা হোক। তাকে উঠতেই হবে। বাঘটাকে মহান্তদের গোয়ালে বন্দী ক'রেছি। গুলি ক'রে মারতে হবে।

ছেলেটি বাড়ীর ভিতরে গেল। ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে, কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না।

লোকগুলিও নাছোড়বান্দা, তাহারা বলিল,—উঠতে পারবে না কি রকম! এখান থেকে আমরা তার গলা শুনতে পাচ্ছি। সে তো উঠেই আছে।

ছেলেটি আবার বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, না, তিনি কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে, গুলির নিশানা হইবে না।

—তবু বন্দুকটা দিতে বল। আমরা অন্য লোক দিয়ে গুলি করাবো। বড় বাবুই ক'রতে পারবেন, কি বল হে চন্দরা?

এমন সময়ে কাশী হালদার মাথায় পাগড়ী জড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মিষ্টি হাসিয়া বলিল,—বন্দুক দোব কি ক'রে হে? আমি ছাড়া আর কারও ও বন্দুক ছোঁবার 'লাইসেন্' আছে?

লোকগুলি সকাল হইতেই উত্তেজিত হইয়াছিল। এখন চটিয়া বলিল,—তাহ'লে বাঘ মারার কি হবে?

হালদার অবলীলাক্রমে হাতের তালু উল্টাইয়া বলিল,—তা আমি কি জানি!

এ কথায় লোকগুলি চটিয়া আগুন হইল। বলিল,—তুমি

জান না, বটে ? তোমাকে গাঁয়ে বাস ক'রতে হবে না ? ছেলে মেয়ের বিয়ে পৈতে দিতে হবে না ? পাঁচজনকে কাজকর্ম্মে ডাকতে হবে না ? তখন দেখে নোব জানো কিনা।

এবারে হালদার যেন অনেকটা নরম হইল। কহিল,—তুমি তো বলছ বটে হে, চন্দরা। কিন্তু তিনটি বুলেটের দাম একটি টাকা। টাকাটি দেবে কে শুনি ? তুমি দেবে ?

—আমি কেন দেবে ? দরকার যদি হয়, গাঁয়ের ষোলো আনা চাঁদা তুলে দেবে।

—ওঃ ! ষোলো আনা চাঁদা তুলে দেবে ! তবেই হ'য়েছে !—হালদার ঠোঁট উল্টাইয়া হাসিল।

চন্দরা অসহিষ্ণু ভাবে তাহার হাতে একটা ঝাঁকি দিয়া কহিল,—আচ্ছা, একটা টাকা তুমি আমার কাছেই নিও হে। তারপর সে চাদা তুল্‌তে হয়, যা ক'রতে হয় আমি বুঝবো।

মানুষের বিপদের সময় মোচড় দিয়া অমনি ভাবে টাকা আদায়ের অভ্যাস হালদারের চিরকালের। সে সন্দিগ্ধ ভাবে চন্দরার পানে চাহিয়া বাড়ী যাইতে যাইতে বলিল,—দেখো ভাই চন্দরা, বত্রিশ বন্ধনের মধ্যে কথাটা ব'ল্‌লে। তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে। আমি আর কি ব'লবো ?

হালদারবাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইতেই চন্দরা পাশের লোকটির গা টিপিয়া বলিল,—তিনটি বুলেটের দাম এক টাকা। শুনেছ

হে! কার্য্য তো উদ্ধার হোক্, তারপরে দেখা যাবে কত জলে কত মুসুরী ভেজে।

হালদারকে পরম সমাদরে গোয়ালঘরের চালের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে তিনটি বুলেট। কিন্তু নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়াও ব্যাঘ্রের চাল-চলন, সক্রোধ দৃষ্টি দেখিয়া তাহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল।

উঁহুঁ, অমন ক'রে নয়,—অমন ক'রে নয়। একটা দাবা বাঁশ চালের ভেতর দিয়ে নামিয়ে দাও। দিয়ে জন পাঁচেক বলাধান লোক সেইটে বেশ বাগিয়ে ধরো,—যেন নড়ে না। আর আমার মাজায় দড়ি দিয়ে বেশ ক'রে বাঁধো। দেখ্‌ছো না, বাতের যন্ত্রণায় মাজা হিল্‌ছে।

তাহাই করা হইল। বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া হালদারকে বাঁধা হইল, যাহাতে তাহার কোমর না নড়ে। তারপরে হালদার বেশ করিয়া বন্দুক উঁচাইতেই বাঘটা থাবা গাড়িয়া বসিয়া নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। সে চাহনিতে তাহার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কোন রকমে ঘোড়াটা টিপিতেই গুড়ুম করিয়া একটা আওয়াজ হইল। এই পর্য্যন্ত হালদারের মনে আছে। তারপরে কখন যে গুলি খাইয়া বাঘটা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া চালের মট্‌কা পর্য্যন্ত লাফাইয়া উঠিল, আর কখনই বা তাহার বন্দুকটা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল, সে সকল কিছুই মনে পড়ে না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিল বাঘটা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখ দিয়া অঝোরে রক্ত গড়াইতেছে,—সে রক্তে গোয়ালঘরের মেঝে কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। আর লোকগুলা সেই ভারী বাঁশটা দিয়া বাঘের মুখে-পেটে ক্রমাগত গুঁতাইতেছে। কিন্তু সে সমস্ত দেখিয়াও সে কিছু মাত্র উৎসাহিত হইল না। যেন শুধু বলিল, —একটু জল।

বাঘ মরিয়াছে! বাঘ মরিয়াছে!

কথাটা শুনিয়া মানুষের দেহে প্রাণ আসিল। যে যাহাকে দেখে, সেই তাহাকে উৎসাহের সঙ্গে সংবাদটা দেয়, যেন সে-ই বাঘটা মরিয়াছে। মেয়েরা ত সমস্ত দিনের পর বাহিরে আসিয়া আলোর মুখ দেখিয়া বাঁচিল। সমস্ত দিন কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়ে লইয়া দুরু দুরু বক্ষে ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ছেলেদের মনে এমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, যে কেহ একটা টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করে নাই।

অপরাহ্ণ বেলায় একখানি মহিষের গাড়ীতে বাঘের মৃতদেহ লইয়া লোকে গ্রাম-প্রদক্ষিণে বাহির হইল। ছেলেরা মরা বাঘের উপর অকারণেই মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। যে জন্তুটা এত লোককে জখম করিয়াছে, এবং গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতাকে সমস্ত দিন একপ্রকার অনাহারে রাখিয়াছে, তাহার প্রতি ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। মরার পর জানা গেল,

বাঘটার বসন্ত হইয়াছিল। সেইজন্য সে বেশ কাবু হইয়াছিল। নহিলে তো গ্রামে আর লোক রাখিত না। তাহাকে যে এখন সকলে খোঁচা দিবে তাহা আর বিচিত্র কি ?

মহান্তদের গোয়াল হইতে মিছিল বেণেপাড়ার ভিতর দিয়া ঠাকুরপাড়ায় পৌঁছিল। প্রথমে হরিহর ঠাকুরের বাড়ী, তার পরেই চাটুয্যে বাড়ী। বাঘের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই চাটুয্যেগিন্নী একটা ঘটি হাতে করিয়া আসিয়া একবার সাশ্রুনেত্রে বাঘটার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—কা'র শাপে এসেছিলি বাবা! বাঘ তো নোস্, বাঘ হ'য়ে ছ'লতে এসেছিলি! আমি যে তোকে দেখেই চিনেছি!

চাটুয্যেগিন্নী ঘটির জল দিয়া বাঘের চারিটি পা ধুইয়া দিয়া, পথের উপরেই গড় হইয়া প্রণাম করিলেন।

হরিহর ঠাকুরের স্ত্রী এমনি মজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চাটুয্যেগিন্নীর কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার ঠোঁটের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনিও ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে একঘটি জল আনিয়া বাঘের চরণ প্রক্ষালন করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, পুত্রকন্যার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

এক মুহূর্ত্তে বাঘ দেবতা হইয়া গেল। কাহার শাপে তিনি ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিয়াছেন, কেনইবা এই গ্রামের নিরীহ বাঙালী সন্তানকে এতক্ষণ ধরিয়া ছলনা করিলেন এবং চাটুয্যে-

গিন্নীইবা শকটারূঢ় মৃত ব্যাঘ্রদেহ দেখিয়া কি করিয়া চিনিলেন, এ সকল বিষয়ে চাটুয্যেগিন্নীকে কেহ কোনো প্রকার প্রশ্ন করারও প্রয়োজন বোধ করিল না। যে পথে বাঘ যায় তাহার দু-পাশে কাতার দিয়া মেয়েরা আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল এবং বিসর্জ্জনের প্রতিমাকে যেমন মহা ভক্তিভরে গলদশ্রুলোচনে বিদায় দেয়, তেমনি করিয়া বিদায় দিতে লাগিল। বাঘের বড় বড় থাবা সধবা মেয়ের দেওয়া সিন্দূরে রাঙা হইয়া উঠিল।

যে কয়টা ছোঁড়া এতক্ষণ খোঁচা দিতেছিল, বড়দের তাড়া খাইয়া তাহারা পিছনে হটিয়া গেল এবং বড়দের মুখ দেখিয়া মনে হইল, বাঘটাকে চালচিত্র দিয়া ঘিরিয়া প্রতিমার মতো সাজাইয়া লইয়া যাইবার উপায় থাকিলে, তাহারা কাঁধে করিয়াই গ্রাম-প্রদক্ষিণ করিত।

মনের গহনে

মনের গহনে

এ-পাশে শিবের মণ্ডপ। মাঝখানে একটা ডোবা। ও-পাশে নদাই ঘোষের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর।

শিবের মণ্ডপ জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছাদের খানিকটা অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। থামগুলা সরু হইয়া আসিয়াছে, গাজনের ঢাক বাজিলে বুড়া মানুষের দাঁতের মত হল্ হল্ করিয়া নড়ে। তথাপি যে ভাঙিয়া পড়ে না, সে নিশ্চয় বাবা ধর্ম্মরাজের মহিমা। প্রতি বৎসর গাজনের সময় মণ্ডপের মাতব্বরেরা মণ্ডপ সংস্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করে। গাজন কাটিয়া যায়, কিন্তু চাঁদা উঠে না। আবার যে কে সেই। এমনি করিয়া বছরের পর বছর কাটে। মণ্ডপের অবস্থা জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হয়। মণ্ডপের 'দেয়াসীন' ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা কোটে। বাবা ধর্ম্মরাজ অবশেষে তাহার স্কন্ধে ভর্ করেন। 'দেয়াসীন' মণ্ডপের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দেয়। ভক্তেরা ঘন ঘন 'বলো শিবো ধর্ম্মরাজ' বলিয়া চীৎকার করে, কেহবা দেয়াসীনকে বাতাস করে, কেহবা বেতের ছড়িটা দিয়া ভিড় সরায়।

—বাবা, কি অপরাধ হ'য়েছে বলুন?

দেয়াসীন পাশের গ্রামের চাঁড়ালদের একটি আধা-বয়সী মেয়ে। পরণে রক্তাম্বর। গলায় এবং হাতে অনেকগুলি রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটা। কথা কহিলেই ভক্ ভক্ করিয়া মদের গন্ধ বাহির

হয়। বাবা সম্বোধন করা হইল তাহাকে নয়, তাহার মাথায় যে দেবতা ভর্ করিয়াছেন তাঁহাকে।

বাবা দেয়াসীনের মুখ দিয়া বলিলেন—আমার ঘরের কি ক'র্লি? কতদিন থেকেই তো ব'ল্ছি। কি ক'র্লি? কি ক'র্লি? জল হবে ভেবেছিস? হবে না ত। তোদের ধান হবে ব'লে কি আমি ভিজবো নাকি? হবে না তো! আমার ঘরের কি ক'র্লি বল্?

বাবা বহুদিন হইতে এমনি ধারা শাসাইয়া আসিতেছেন। গ্রামের যোল আনার বাবার উপর শ্রদ্ধাও অটুট। কিন্তু তথাপি মণ্ডপের সংস্কার আর কয়েক বৎসরে কিছুতে হইয়া উঠিতেছে না। তবু এ-পর্য্যন্ত এই অপরাধে বাবার রুদ্ররোষ কাহারও উপর নামে নাই। গ্রামের লোকে বাবার মন্দিরের ধূলা জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে ললাট পর্য্যন্ত ভক্তিভরে স্পর্শ করে। বলে,—বাবা আমাদের সদাশিব। নইলে এত অপরাধের বোঝা নিয়ে কোন দিন ভরাডুবি হ'য়ে যেত। ছেলেপুলে নিয়ে...।

না, বাবার সদাশিবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। এতগুলি সন্তানের সম্বৎসরের সমস্ত অপরাধের বিষ তিনি নিজের কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া, গাজনের কয়টা দিন বিনা আপত্তিতে রৌদ্রে পোড়েন এবং বৃষ্টিতে ভেজেন। তাঁহার পক্ষে সুখের কথা এই যে, বেশী দিন এই ভাঙা মণ্ডপে তাঁহাকে বাস করিতে হয় না। বারো মাসই পুরোহিত-গৃহে থাকেন।

মণ্ডপের অবস্থা এইরূপ।

ডোবার অবস্থাও তাহার চেয়ে ভাল নয়। এ-পাড়ার এইটিই খিড়্‌কী বলিলে খিড়্‌কী, সদর বলিলে সদর। বাসনমাজা, হাত-পা ধোওয়া এই জলেই হয়। মুখে দিবার উপায় থাকিলে মুখ ধোওয়াও চলিত। কিন্তু সে উপায় নাই। শুধু এই ঘাটের দিকটা ছাড়া বাকী সাড়ে তিন দিকে দুর্ভেদ্য বাঁশের ঝাড় এমন অন্ধকার করিয়া আছে যে, জলে সূর্য্যালোক পড়িবার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই।

এ-কথা শুনিয়া শহরের লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সমস্ত ব্যাপার ত তাঁহারা জানেন না। পাড়াগাঁয়ে বাঁশ নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। ঘর-ছাওয়া, খুঁটি তৈরি করা আছেই। বাঁশের পাতা জলে পড়িয়া জল নষ্ট করে, এ তথ্য তাহাদের নিজেদেরও অবিদিত নয়। কিন্তু উপায় কি? প্রতিবেশীরা কেহই ভাল লোক নয়। চোখের সুমুখ হইতেই বাঁশ চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছে; দূরে চোখের আড়াল হইলে কি আর ঝাড়ের চিহ্ন রাখিত?

শুধু তাহাই নয়। এই অতি তুচ্ছ ডোবাটিই এ-পাড়ার একটি মূল্যবান সম্পত্তি। সম্বৎসরের শাক ইহাতেই উৎপন্ন হয়। তাহা তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। ঘাটের উপর সম্মুখ দিকে হাত দুই মাত্র স্থান ছাড়া বাকী সমস্তই শাক, শাক, শাক—জল নজরে পড়ে না। এক-এক পরিবার এক-একটি মাত্র কঞ্চির সাহায্যে অদ্ভুত কৌশলে

নিজের নিজের শাক আটকাইয়া রাখিয়াছে। এদিকের শাক ওদিকে যাইবার উপায় নাই। তাও কি আর যায় না! কিন্তু সে ক্বচিৎ! তখন এই শাক লইয়াই একটা ফৌজদারী বাধিয়া যায়।

কিন্তু শুধুই কি শাক! আপনি নয়টা-দশটার সময় যদি এদিকে আসেন, দেখিবেন,—অবশ্য একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে,—দেখিবেন, একটি বৃদ্ধ সেই বাঁশবনের নীচে অন্ধকারে অন্ধকারে বকের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বাঁ-হাতে একটা ভাঙা এনামেলের বাটিতে কতকগুলা কেঁচো এবং একটা সরু তালপাতায় গাঁথা কতকগুলি ন্যাটা, মাগুর ইত্যাদি মাছ। তিন-চারিটি মাত্র। এই কয়টি সংগ্রহ করিতেই তাহাকে বার-দুই ডোবার ধারে ধারে পরিক্রমণ করিতে হইয়াছে।

এই লোকটিই নদাই ঘোষ!

বয়স পঞ্চাশের বেশী হইবে না। কিন্তু দেখিলে মনে হয় ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শীর্ণ, দীর্ঘ দেহ,—কোমর বাঁকিয়া গিয়াছে। চোখ কোটর-প্রবিষ্ট, চর্ম্ম লোল এবং কর্কশ। বাঁ পা-খানা অস্বাভাবিক রকম সরু। সেজন্য খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে। মুখে দাঁত বলিতে একটিও নাই। শীর্ণ, ভাঙা গাল একেবারে মুখের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

ডোবার ওধারে তাহার বাড়ী এবং এই ডোবাটি শুধু শাক নয়, তাহার সম্বৎসরের মাছও সরবরাহ করে। অভাব কেবল অন্নের

এবং বস্ত্রের। কিন্তু সে আর কতই বা! এক জোড়া বস্ত্র তাহার দিব্য একটা বৎসর চলিয়া যায়। আর অন্ন? একটা পেটে কতই বা লাগে? সপ্তাহে দুইটা দিন মুনিশ খাটিলেই সে-অন্নের সংস্থান হইত। যত দিন শরীর সামর্থ্য ছিল তার বেশী সে কখনও খাটেও নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যদি কখনও কেহ মাঠে খাটিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিত, পেটের ব্যথার অজুহাতে প্রায়ই তাহাকে সে ঘুরাইয়া দিত। লোকটা উহারই মধ্যে একটু শয্যা-বিলাসী। বেলা নয়টার আগে আর তাহার অতি-পুরাতন ছিন্ন মলিন শয্যার বাহিরে পারতপক্ষে আসে না। যখন শরীর সামর্থ্য ছিল তখনও আসিত না, এখনও না।

অবশ্য শরীরে সামর্থ্য ছিল বলিতে এ-কথা বুঝিলে ভুল হইবে যে এককালে তাহার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল। যথেষ্ট সামর্থ্য তাহার কোন কালেই ছিল না। চিরদিনই অমনি ঢ্যাঙা এবং লিকলিকে দেহ, কোলের কাছে কুঁজো। গত পঁচিশ বৎসর কাল বছরে ছয় মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে সামর্থ্য আর থাকে কি করিয়া? তা নয়, তবে পেটের ভাতের সংস্থানের জন্য সপ্তাহে দুই তিন দিন মাঠে খাটিতে যেটুকু সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, সেটুকু সামর্থ্য এতকাল ছিল! কিন্তু গত দশ বৎসর হইতে আর তাহাও নাই। এখন আর মাঠে খাটিতে পারে না।

সে একপক্ষে ভালই হইয়াছে। সকালবেলায় মাঠে খাটিতে

যাইবার জন্য এখন আর কেহ অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বিরক্ত করিতে আসে না। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ঘুমটা হয়। ডোবার মাছ এবং শাক ত আছেই। আর আছে ডোবার ধারে কয়েক ঝাড় বাঁশ। তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার বৎসরের কাপড় দু'খানির দাম ওঠে। আর···!

এইখানেই তাহার ভাগ্যকে অসাধারণ বলা চলে।

যৌবনে নদাই ঘোষের বিবাহ হয় নাই। কতকটা কন্যাপক্ষীয়-দের দোষে। পণ না লইয়া কেহই এই সুপাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। কতকটা তাহার নিজের অলসতায়। তাহার নিজের তরফ হইতেও কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। আর কতকটা আত্মীয়জনের অভাবে। মা-বাপ ছেলেবেলাতেই হারাইয়াছে। বড় কিংবা ছোট একটা ভাই পর্য্যন্ত নাই, যে খুঁজিয়া-পাতিয়া ভায়ের জন্য একটি বধূ সংগ্রহ করিয়া আনিবে। যৌবনটা এমনি করিয়াই কখন যে কাটিয়া গেল বোঝাই গেল না। অবশেষে, চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়, ম্যালেরিয়ার হাতে পড়িয়া শরীর যখন জীর্ণ, একমাত্র প্লীহাবিপুল উদরপ্রদেশ ছাড়া, দেখাইবার মত কিছুই যখন অবশিষ্ট নাই, তখন অকস্মাৎ এক শুভলগ্নে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ছোটবাবুর বহু কীর্ত্তির মধ্যে এই এক কীর্ত্তি। পাত্র এবং পাত্রী দেখা, লগ্নপত্র, সম্পাদন, আশী-র্ব্বাদ, গাত্রহরিদ্রা, শোভাযাত্রা, বিবাহ, বাসরশয়ন, পাকস্পর্শ, ফুলশয্যা,

মনের গহনে

—এক কথায় সংবাদপত্রে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়া ছাড়া সমারোহ বলিতে আর যাহা-কিছু বোঝায়, তাহার কোথাও ত্রুটি ছিল না। নহবৎ বসিল। ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁশি বাজিল। এমন কি ছেলেরা তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া শেষে কতকগুলা টিন আনিয়া বাজাইতে লাগিল। এজন্য একটি পয়সাও নদাইকে ব্যয় করিতে হয় নাই। সমস্ত ছোটবাবু নিজের পকেট হইতে দিয়াছেন। পাঁচ জনের কাছে কিছু চাঁদাও উঠিয়াছিল। নদাই মনে মনে খুশী হইলেও খুব লজ্জিতই বোধ করিতেছিল। এ-বয়সে আর কেন এ-সব ?

নদাই মিথ্যা বলে নাই। সত্যই এ-বয়সে আর এ-সবের প্রয়োজন ছিল না, এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হইল। ফুলশয্যার সকালে বহুকষ্টে আনক খোঁজাখুঁজির পর কেবল নদাইকে পাওয়া গেল,—হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় খাটের নীচে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। বধূ নাই। ঘরে, বাহিরে, কোথাও নাই। এমন কি ছোটবাবু নিজে লোক নামাইয়া ডোবার জলে পর্য্যন্ত খোঁজ করিলেন। সেখানেও নাই! সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই খোঁজ করা হইল। কোথাও পাওয়া গেল না।

নদাইয়ের জ্ঞান যখন হইল তখন বেলা দশটা। এই রকম সময়েই সাধারণতঃ তাহার ঘুম ভাঙে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল।

তখনও তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। বেচারার ভয়ানক ভয় হইয়াছে। দুই চোখের কোণ বাহিয়া কেবল অশ্রু গড়াইতেছে। উত্তরে সে শুধু হাতের তালু উল্টাইয়া জানাইল, বধূ নাই।

কোথায় গেল ?

জানে না।

তাহাকে এমন হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া গেল কে ?

নদাই আঙুল দিয়া খাটের নীচেটা দেখাইয়া দিল।

আরও বেলা হইলে কথাটা স্পষ্ট করিয়া জানা গেল :—

বৌভাতের হাঙ্গামা মিটাইয়া এমনিতেই ফুলশয্যার দেরি হইয়া গিয়াছিল। বর বধূর শুইতে রাত্রি এগারোটা কি বারোটাই হইবে। নদাই বধূর একটা হাত ধরিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ করিতে যাইবে, বউ এক ঝটকা দিয়া হাত টানিয়া লইল। ঠোঁটে হাত দিয়া ইঙ্গিতে বলিল, চুপ।

নদাই ভাবিল, বোধ করি কেহ জানালার গোড়ায় আড়ি পাতিতেছে। সেই ভয়েই বধূর এই সতর্কতা। আড়ি পাতিবার অবশ্য তাহার কেহ নাই। তবু পাড়ার মেয়েরা কি আর ছাড়িবে ?

বধূ পা ঝুলাইয়া খাটের উপর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নদাইও আর কথা না কহিয়া, যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

এমনি বোধ করি ঘণ্টাখানেক কাটিল।

মনের গহনে

নদাই আর থাকিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে ডান হাতখানি বধূর কাঁধের উপর রাখিল।

—এই—বলিয়া বধূ কাঁধের এক ঝাঁকুনীতে নদাইয়ের হাতটা ফেলিয়া দিল।

আরও অনেকক্ষণ কাটিল। ছোটবাবুদের বালাখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নদাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বধূ ঠায় তেমনি বসিয়া আছে।

নদাই ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার ঘুম পায় নি ?

বধূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, পায় নাই।

—দুটো বাজে যে।

—বাজুক।

—হ্যাঁ, বাজবে বইকি ? এস—বলিয়া নদাই যেমন বধূকে বাহুপাশে বাঁধিতে যাইবে, অমনি বধূ তড়াক্ করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়াই ফস্ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। তারপর কোথা দিয়া কি হইল, ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প হয়, যম-দূতের মত কতকগুলো লোক পট্ পট্ করিয়া তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া, বোধহয় বউ লইয়া চলিয়া গেল। নইলে বউ গেল কোথায় ? মোট কথা, তাহার পরে ঠিক কি যে হইল তাহা আর স্মরণ নাই।

ছোটবাবু অনেক ভাবিয়া বলিলেন—সেই যমদূতগুলো নিশ্চয় এর নীচে ছিল। বলিয়া আঙুল দিয়া খাটের নীচেটা নির্দ্দেশ করিলেন।

নিতান্ত ভালমানুষের মত নদাই বলিল—বোধ হয়।

সে যাহাই হউক, সময় এবং স্রোতের মত বধূও একবার গেলে আর ফিরিয়া আসে না। বধূ আর কোন দিন স্বামীর ঘর করিতে আসিল না। নদাইও ঘৃণায় লজ্জায় তাহার কথা আর জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বধূ না আসিলেও বধূর পিতৃগৃহ হইতে মাসের মধ্যে দুইবার কোন-না-কোন পর্ব্ব উপলক্ষ্যে চাল, ডাল, নুন, তেল হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্য এত পরিমাণে আসিতে লাগিল যে, নদাইয়ের অন্নসমস্যার চিহ্নমাত্র রহিল না। এইজন্যও বধূর বিয়োগব্যথা নদাই-য়ের বুক হইতে অনেকটা দূর হইল। আর বাকীটা দূর হইল ছোটবাবুর আশ্বাসে।

ছোটবাবু এ-গ্রামের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ-গ্রামের ষোল আনারই তিনি জমিদার। বছর চল্লিশ বয়স। দিব্য সুপুরুষ চেহারা। লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই। কিন্তু গানে, বাজনায়, বক্তৃতায় অদ্বিতীয়। বস্তুতপক্ষে এখানকার থিয়েটার পার্টির ইনিই প্রাণ-স্বরূপ! অত্যন্ত আমুদে লোক,—যাহাকে বলে মজলিসী। নদাই তাঁহার অত্যন্ত স্নেহভাজন।

কিছু দিন নদাই মুখ বুঁজিয়াই কাটাইল। পাড়ার লোকেরা তাহার স্ত্রী-ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং শ্বশুর-ভাগ্যের জন্য আনন্দ জ্ঞাপন করে।

—মেয়েমানুষের কথা ছেড়ে দাও ঘোষ, ওদের চরিত্র দেবতারা পর্য্যন্ত বুঝতে পারেন না। কিন্তু এমন শ্বশুর ক'জনের হয় বল ত? মাসে দু-বার তত্ত্ব করা কি এই বাজারে সোজা ব্যাপার না কি?

নদাই হাঁ না কোন কথাই বলে না। কিন্তু আলোচনাটা শুনিবার জন্য বসে। লোকে এই দুষ্কার্য্যের পাণ্ডা কে কে তাহা অনুমান করিবার জন্য বহুলোকের নাম করে। তাহারা পাড়ারই ছেলে-ছোকরা। কথাটা নদাই ঘোষের মনে লাগিলেও, সে মুখ ফুটিয়া সমর্থন করিতে ভয় পায়। ছেলেগুলা সত্যই দুষ্‌মন-প্রকৃতির। নদাই চুপ করিয়া থাকে। মনে মনে ভাবে, অমন সুন্দরী মেয়ে তাহার কপালে সহিবে কেন? মেয়ের মুখ সে দেখিয়াছে।

অবশেষে নদাই এক দিন ছোটবাবুকে ধরিয়া বসিল। বিবাহ না করিলে তাহার একটি দিনও চলিতেছে না। এই বয়সে নিজে হাত পোড়াইয়া রান্না করার ঝকমারি কি সহজ!

এই কথা!

ছোটবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্বাস দিলেন, এক পক্ষের মধ্যে বিবাহ দিয়া তবে তাঁহার অন্য কাজ।

মনের গহনে

ছোটবাবু ইচ্ছা করিলে, কি না হয়। এক পক্ষও অপেক্ষা করিতে হইল না। তুই-তিন দিনের মধ্যেই কোথাকার কে এক জন আসিয়া পাত্র দেখিয়া গেল। দেখামাত্র পাত্র পছন্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ এবং দিন স্থির।

পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতার মনে খুশী আর ধরে না। কেবল নদাই নিজে একটু খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। মেয়েটি নাকি কালো। নদাইয়ের স্মৃতিপটে তখনও তাহার প্রথমা পত্নীর অপরূপ রূপলাবণ্য ভাসিতেছিল। কিন্তু এ-আত্তির কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে সাহস করিল না।

শুভদৃষ্টির সময় মনে হইল, মুখ ফুটিয়া বলিলেই ভাল ছিল। প্রথমা পত্নীর শুধু রংটাই ফর্সা ছিল না, মুখখানিও ছিল বেশ কচি। এ-মেয়ে যেমন কালো, তেমনি কুৎসিত। মুখের গড়ন একেবারে পুরুষালি। গাল ভাঙিয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, এবং শুভদৃষ্টির সময় এমন কটমট করিয়া চাহিল যে নদাই শিহরিয়া উঠিয়া ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিল।

বউ দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা নাদাইকে শুনাইয়া বলিয়া গেল,—বেশ বউ হয়েছে। কালো হ'ল তো কি হ'ল? রূপ নিয়ে কি মানুষ ধুয়ে থাবে? বেশ বউ হয়েছে। এ-মেয়ে নিয়ে তু-দিন তবু ঘর করতে পাবে।

কিন্তু তাহাদের কথায় নদাই কিছুমাত্র আশ্বাস পাইল বলিয়া

মনে হইল না। তাহার মনে পড়িতে লাগিল, সেই কোটর-প্রবিষ্ট চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। মনে পড়ে, আর ভয়ে চোখ বোঁজে।

সেদিন 'কালরাত্রি'। বধূ-সম্ভাষণের বালাই নাই। মন্দ কাটিল না। কিন্তু পরের দিন সকাল হইতেই জ্বরজ্বর করিতে লাগিল। রাত্রে তাহাকে এক প্রকার জোর করিয়া ঠেলিয়া ঘরে পাঠানো হইল। বধূ তখন দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। মেয়েদের সম্বন্ধে নদাইয়ের অবশ্য কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নাই। তথাপি এই ভাবে যে কোন রমণী কখনও বসিতে পারে, তাহা সে জীবনে দেখে নাই।

বধূটির বোধ করি একটু নিদ্রার ভাব আসিয়াছিল। নদাইয়ের পদশব্দ টের পায় নাই। নদাই দরজাটা বন্ধ করিতেই বধূ জাগিয়া উঠিয়া ভাল করিয়া বসিল। নদাই খাটের দিকে আগাইয়া আসিতে-ছিল। বধূর চোখে চোখ পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইল।

নববধূই আগে কথা কহিল! মেঝেয় যে মাদুরখানি পাতা ছিল সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ওইখানে শুয়ে চুপটি ক'রে ঘুমিয়ে পড়। এদিকে এসেছ কি খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব।

কণ্ঠ ত নয়, যেন একসঙ্গে অনেকগুলি ভাঙা থালাবাসন ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আচ্ছা মেয়েদের পাল্লায় পড়িয়াছে যা হোক।

মনের গহনে

—আমার কাছে এসেছ কি, তোমারই এক দিন আর আমারই এক দিন। বুঝলে?

নদাই বিনা বাক্যব্যয়ে মেঝের মাদুরে শুইয়া পড়িল এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া জাগিয়া শুনিতে লাগিল, নব-বধূর নাসিকা বিচিত্র স্বরে গর্জ্জন করিতেছে। তার পরে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কখন এক সময় সে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকালে দেখা গেল এই মেয়েটিও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বহু লোক জড় হইল। ছোটবাবু নিজে আসিয়া সকলকে শুনাইয়া বোধ করি বাতাসকে শাসাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাকে পাওয়া গেল না। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নদাই বধূর শোকে প্রকাশ্য-ভাবে এমন কান্না কাঁদিতে লাগিল. যে সমস্ত লোককে শুধু হাসি চাপিবার জন্য ছুটিয়া পলাইতে হইল।

এই ঘটনার পর কয় দিন পর্য্যন্ত নদাই বিছানা ছাড়িয়া ওঠে নাই,—জ্বরের জন্য নয়, শোকে। ছোটবাবুর চাকর প্রত্যহ ভাত লইয়া আসিয়া বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে তাহাকে দুটি অন্ন গ্রহণ করাইতে সমর্থ হয়।

দেখিতে দেখিতে নদাই একেবারে উন্মাদ হইয়া গেল

মনের গহনে

রাস্তায় বাহির হইলেই ছেলেরা পিছনে লাগে। প্রথম প্রথম নদাই ইঁট, কাঠ, হাতের কাছে যাহা পাইত, তাহা লইয়া তাড়া করিত। কিন্তু সব সময় ইঁট, কাঠ হাতের কাছে পাওয়া যায় না দেখিয়া অবশেষে লাঠি লইয়া বাহির হইত। শেষে দেখিল কিছুতেই তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। নাগালের বাহিরে থাকিয়া তাহারা কেবলই বিরক্ত করে। নদাই বাহিরে বাহির হওয়া ছাড়িয়াই দিল। দিন-রাত্রি বাড়ীর মধ্যেই থাকে এবং আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি বকে।

তাহার অবস্থা দেখিয়া ছোটবাবু বলিলেন—আমি বলি কি, নদাই, তুমি আর একটা বিয়ে কর। এই বয়সে যত্ন-আত্তি করার লোক নইলে চলে ?

নদাই একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিল।

—কি যে বলেন ছোটবাবু ? আবার···হুঁঃ !

ছোটবাবু দু-হাত নাড়িয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, —না, না, আমি তোমার কথা শুনব না। দেখ তো, আমি এমন মেয়ে আনছি···

নদাই আর আপত্তি না করিয়া হাত কচলাইতে লাগিল।

অবশ্য এবার আর বিবাহ হইল না। নদাইয়ের বিষণ্ণ মনটা বিবাহের নামে খুশী হইবে বলিয়াই কেবল কথাটা ছোটবাবু পাড়িয়াছিলেন।

আগের রাত্রে নদাইয়ের জ্বর হইয়াছিল। তখনও একটুখানি জ্বর ছিল। নদাই আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

ছোটবাবু তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ভিতরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—জ্বর কি খুব বেশী নদাই ?

নদাই রোগযন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত করিয়া উত্তর দিল,—নাঃ ! ছেড়ে যাবে এক্ষুণি।

ম্যালেরিয়া জ্বর। মানুষ আর কত উপবাস পালন করিবে ? এদিকের সকলেই জ্বর ছাড়িয়া গেলেই দু'টিখানি ভাত খায়।

ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহ'লে তোমার খাওয়া-দাওয়ার··· !

—থাক, হবে এখন।

ছোটবাবু একটু ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—তাহ'লে আমি বরং তোমার ভাত পাঠিয়ে দোব। কি বল ?

কপালের রগ দুইটা টিপিয়া ধরিয়া নদাই বলিল—তাই করবেন।

ছোটবাবুর আর অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। মধ্যে দুইটা দিন, তার পরেই পূজা। নহবৎ বসিয়া গিয়াছে। প্রতিমা-তৈরিও শেষ হইয়া আসিল। এখন হইতেই বাড়ীতে সমারোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বলা চলে,—বিশেষ করিয়া ছেলেমহলে এবং মেয়েমহলে। তিনি চলিয়া গেলেন।

মনের গহনে

সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিন রাত্রি গান হয়,—ছোটবাবুর নিজেরই থিয়েটার পার্টির। কিন্তু পাশের গ্রামে যে সখের যাত্রার দল আছে, এ-আসরে কখনও তাহারা গান করে নাই। এবারে তাহারা ধরিয়া পড়িয়াছে, দুর্গাপূজাতে তাহারা এক দিন গান করিবে। ছোটবাবু তাহাদের 'না' বলিতে পারেন নাই। স্থির হইয়াছে, অষ্টমীর রাত্রে তাহাদের গান হইবে।

ষষ্ঠী এবং সপ্তমী এই দুইটা দিন নদাই ভাল ছিল। অষ্টমীর দিন আর থাকিতে না পারিয়া, ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে নাটমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন সন্ধ্যা অনেক ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গান আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু বিস্তীর্ণ শামিয়ানার নীচে ভিড় বেশ জমিয়াছে, এবং সেখানকার জনকল্লোল অনেক দূর হইতেই শ্রুতিগোচর হয়। প্রবেশপথের মুখেই দুই পাশে দুটি 'হুমহুমি' স্বল্প আলোক এবং প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। লোকে আসিবার সময় সেখানে একবার দাঁড়াইয়া বিড়ি ধরাইয়া লইতেছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত সৌখীন লোক এবং ছোকরা বয়সের। মাথায় ঢেউ-খেলানো এলবার্ট টেরী আছে। কাহারও গায়ে পাঞ্জাবী, কাহারও কোট। তাহার উপর কাপড়খানি কোমরে 'গোয়ালছাঁদে' বাঁধা। যাহাদের গায়ে কিছুই নাই, তাহারা আসরের পশ্চিম দিকটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। খড়ের ধোঁয়ায় সেদিকটা অন্ধকার,—দৃষ্টি চলে না। দলের পর দল

আসিতেছে। আসিয়া পরস্পরের সঙ্গে কলহ অথবা কুশল প্রশ্নের পরেই তামাক খাওয়ার পালা। হুঁকা, কলিকা, তামাক এবং যথেষ্টসংখ্যক পাকানো খড়ের 'নুটি' সঙ্গেই আছে। চকমকি ঠুকিয়া অগ্নিগর্ভ শোলার উপর সে 'নুটি' বসাইয়া দুইটা ফুঁ দিলেই গল্‌গল্‌ করিয়া ধোঁয়া ওঠে। ভাগ্য ভাল যে, শুধু মাথার উপরের দিকটাই শামিয়ানা দিয়া বন্ধ। চারিপাশ বন্ধ থাকিলে, যে-পরিমাণ ধোঁয়া উদ্গত হইতেছে তাহাতে নাটমন্দির-সমেত সমস্ত স্থানটা বেলুনের মত উর্দ্ধে উঠিতে থাকিলেও বিস্মিত হইবার কোন কারণ ঘটিত না।

ওদিকের বড় বারান্দায় চিক টাঙাইয়া মেয়েদের জায়গা করা হইয়াছে। আর সমাগত ভদ্রলোকেদের বসিবার জায়গা হইয়াছে দক্ষিণ দিকের বারান্দায়। নদাই সেই দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোটবাবুর কাছে বসিয়া গান না শুনিলে নদাইয়ের সুখ হয় না। বারান্দার এক পাশে গোটাকয়েক তাকিয়া লইয়া ছোটবাবু বসিয়া থাকেন। তাঁহার পাশেই বারান্দায় পা ঝুলাইয়া একটা থামে ঠেস্‌ দিয়া নদাই মাঝে মাঝে ঘুমায় এবং মাঝে মাঝে গান শোনে। নদাইকে দেখিয়া ছোটবাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এত দিনের অভ্যাসে তিনিও যেন কোথায় একটু ফাঁক অনুভব করিতেছিলেন। নদাই তাহার চিরদিনের বিনীত হাসি হাসিয়া নিজের জায়গাটিতে গিয়া বসিল।

মনের গহনে

গোটা-দুই কন্‌সার্টের পরেই অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল,—ধ্রুব চরিত্র। জীমূতবর্ণ, বিপুলকায় মহারাজা ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া, আসরেই গড় হইয়া মা-দুর্গাকে প্রণাম করিয়া চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘগ্রীব, অত্যন্ত শীর্ণকায় মন্ত্রী এবং বাম পার্শ্বে বেঁটে, কাঠ-কাঠ গড়নের সেনাপতি আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজার দৃষ্টি সম্মুখে স্থির ভাবে নিবদ্ধ। মন্ত্রীবর নিতান্ত নিরীহ স্বভাব ভালমানুষ ভদ্রলোক। আসরে আসিয়া সেই যে চোখ নামাইলেন আর তুলিলেন না। সেনাপতির বয়স অল্প। আসিয়াই একবার চারি দিকে চাহিয়া লইলেন। উপরের আলো এবং তরবারির দৈর্ঘ্য মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, রণোন্মত্ত-তায় তরবারির খোঁচা লাগিয়া আলোটা ভাঙিয়া যাইতে পারে কিনা। অন্য আসরে একবার সে-দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছে।

রাজা জলদগম্ভীরকণ্ঠে রাজ্যের বিবরণ জানিতে চাহিলেন। মন্ত্রীবর আধ-আধ শীর্ণকণ্ঠে তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া থামিতেই, সেনপতি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিশুদ্ধ বাংলায় প্রায় পাচ মিনিটকাল অনর্গল এত কথা বলিয়া গেলেন এবং তরবারিটা এতবার আস্ফালন করিলেন যে, সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া গেল। আসর নিস্তব্ধ। মাছিটি নড়িলে জানিতে পারা যায়।

ছোটবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—নাঃ! গান এরা জমাবে দেখছি।

মৃদুকণ্ঠে সকলেই সে-কথায় সায় দিলেন। বস্তুতপক্ষে সেনাপতির বীররসোদ্গারের পরে সে-বিষয়ে আর কাহারও মনে সংশয় ছিল না।

রাজা সেনাপতির মতেই মত দিলেন। তাহাই হয়। পৃথিবীতে কোন কালেই ভালমানুষের জয় হয় না। দর্শকদেরও মন্ত্রীর উপর সহানুভূতি ছিল না। লোকটার একটা ভাল পোষাক পর্য্যন্ত নাই।

সে যাহাই হউক, কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর মন্ত্রী এবং সেনাপতি উভয়েই প্রস্থান করিলেন এবং ম্যানেজার বংশীধ্বনি করিবামাত্র সুয়োরাণী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নদাই চমকিয়া ছোটবাবুর পায়ে হাত দিল।

—কি হ'ল?

—কিছু নয়। বলিয়াই নদাই হাতখানি সরাইয়া লইল।

আশ্চর্য্য মিল! অবিকল তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মত! তেমনই ভাঙা গাল, কোটর-প্রবিষ্ট জলন্ত চোখ যেন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে! মুখের গড়নও তেমনি পুরুষালি। সুয়োরাণী আসিয়াই চেঁচাইতে লাগিলেন। ধ্রুব এবং তাহার জননীর সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু অভিযোগ ছিল, তাহা এমন হাত নাড়িয়া বিবৃত করিতে লাগিলেন যে, দর্শকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নদাই কিন্তু সে সকল কথার এক বর্ণও শুনিতেছিল না। তাহার

দ্বিতীয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বর সে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। ইহার চীৎকার শুনিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, দ্বিতীয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বরও ছিল অবিকল এইরূপ। এমনি করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া সে এক দিন তহাকেও ধমকাইয়াছিল। আশ্চর্য্য মিল বটে!

অনেক ক্ষণ ধরিয়া চীৎকার করিয়া অবশেষে সুয়োরাণী চলিয়া গেল। গান জমিয়া গিয়াছে। আসর নিস্তব্ধ। নদাই উঠিয়া বসিয়াছিল, সুয়োরাণী চলিয়া যাইতে আবার থামে ঠেস দিল।

অতঃপর আসিলেন দুয়োরাণী, ধ্রুবের হাত ধরিয়া। এ ছোকরার বীররসের বক্তৃতা নয়, করুণ রসের। 'মহারাজ' বলিয়াই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। কিন্তু করুণ রসের বক্তৃতা ইহাকে মানায় ভাল। রংটি ফরসা, মুখ্‌খানি বেশ ঢল্‌ঢলে, গলার স্বরও মিষ্টি। এক নম্বর বক্তৃতা করিয়াই মাতা-পুত্রে গান আরম্ভ করিল। সে গানের সুরে পাষাণও দ্রব হইল।

কিন্তু নদাই একবার আলস্যভাবে আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়াই সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। স্থান-কাল-পাত্র সমস্তই সে বিস্মৃত হইয়া গেল। এই বিচিত্র আলোকমালা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিবিধ বর্ণের রঙীন পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনি, সমস্ত মিলিয়া তাহাকে যেন কোন্ কল্পলোকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল।

নদাই সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। লোকটা কি একেবারেই

ক্ষেপিয়া গেল না কি? তাহার স্পষ্ট মনে হইল, সম্মুখের ওই অভিনেত্রীটী তাহার প্রথমা পত্নী ছাড়া আর কেহ নয়,—কেহ হইতে পারে না। সেই বড় বড় চোখ, সুচিক্কণ ভ্রূযুগল, ঢলঢলে মুখ। এমন কি চোখের নীচের সেই কাটা দাগটি পর্যান্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উত্তেজিতভাবে নদাই ছোটবাবুর হাত ধরিয়া টান্ দিল।

ছোটবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন—ও কি করছ? একবার হাত ধ'রে টানছ, একবার পা ধ'রে টানছ। তোমার হ'ল কি?

কথা বলিতে নদাইয়ের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। শ্বাস রুদ্ধ করিয়া বলিল—অনেকটা সেই রকম দেখ্তে নয়? অনেকটা?

নদাইয়ের মনের কথা বুঝিয়া ছোটবাবুর হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। প্রাণপণ চেষ্টায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—পাগল নাকি!

ধমক্ খাইয়া নদাই আম্তা-আম্তা করিয়া বলিল—না, তাই ব'ল্ছিলাম।

নদাই উস্খুস্ করিতে লাগিল, এবং কখন একটু একটু করিয়া সরিয়া, সরিতে সরিতে আসরের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া বসিল। হ্যাঁ, অবিকল সেই রকম। কাছে হইতে দেখিয়া তাহার মনে আর কোন সংশয়ই রহিল না। মেয়ে দু'টি যখনই আসরে আসে, দেখে,

বুড়া তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পড়িলেই তাহারা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। বুড়ার কর্ণমূল পর্য্যন্ত গরম হইয়া ওঠে। শরীরের মধ্যে কি যে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া যায়—সে একেবারে অস্থির হইয়া ওঠে। লোকের পর লোক আসে। কেহ গান গায়, কেহ যুদ্ধ করে। কেহ কাঁদে, কেহ হাসে। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হইয়া যায়। বুড়ার সংজ্ঞা নাই। একদৃষ্টে ঠায় চাহিয়া আছে। পালা শেষ হইয়া গেল। লোকজন যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল। বুড়া বসিয়াই আছে। একা! দৃষ্টি তেমনি দূরের দিকে নিবদ্ধ। চাকরেরা যথাসময়ে আলো লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সূর্য্য উঠিয়াছে। নদাই সেইখানেই সতরঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ এমনিভাবে শুইয়া ছিল কে জানে। হঠাৎ বাবুদের বাড়ীর একজন চাকরের নজরে পড়িয়া গেল। সে শতরঞ্চ তুলিতে আসিতেছিল। ডাকাডাকি করিতে নদাই জবাফুলের মত লাল চোখ মেলিয়া চাহিল। ডান হাতখানি বাড়াইয়া যতদূর খোঁজা যায়, কি যেন হাতড়াইয়া খুঁজিল। তারপর বলিল, কোথায় গেল?

—কে?

—আমার বৌ! এই যে এখুনি এখানে আমার পাশে ব'সে মাথা টিপে দিচ্ছিল। এরই মধ্যে আবার পালিয়ে গেল। ওরা কি কেবল পালিয়েই বেড়াবে?

নদাই আবার চোখ বন্ধ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। চাকরটা ছোটবাবুকে ডাকিয়া আনিল। তিনি গায়ে হাত দিয়া দেখেন, ভীষণ জ্বর। অবশ্য ভয়ের কিছু নাই। ম্যালেরিয়ায় কথায় কথায় এক-শ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর ওঠে। ছোটবাবু তখনই তাহাকে নিজের বাড়ীতে উঠাইয়া আনিয়া ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন। ইহার পর আর তাহার বিবাহের চেষ্টা হয় নাই।

ম্যালেরিয়া

মনের গহনে

বহু কালের পুরাতন একখানি গ্রাম। সকল পুরাতন গ্রামের মতো এই গ্রামখানিরও একটি ইতিহাস আছে। কিন্তু সে কথা থাক।

শরৎকালের প্রভাত। কিন্তু শারদ্-শ্রীতে উদ্ভাসিত নয়। প্রভাতের আলো কেমন যেন পাণ্ডুর, মলিন। একটি অপরিচ্ছন্ন, জঙ্গলাকীর্ণ ডোবার ধারে ধারে গুটিকয়েক শীর্ণ-দেহ, নগ্নকায় বালক নিঃশব্দ সতর্কতার সহিত ছিপ হাতে মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের পায়ের চাপে ঝরা পাতায় যে মর্ম্মর-ধ্বনি হইতেছিল, তাহা ছাড়া আর কিছুতে তাহাদের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না।

ডোবার ওদিকের কোণে একটি বক মুনি-ঋষির মতো নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়াছিল। আর একটা মাছরাঙ্গা পাখী ডোবার জলের এক ইঞ্চি উপর দিয়া অবিশ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ডোবার পূর্ব্বদিক দিয়া যে কাঁচা রাস্তাটি মাঠের দিকে গিয়াছে, সেই পথে একটি রাখাল বালক গুটিদুই শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার গরুকে ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে চরাইতে লইয়া যাইতেছিল। পত্র-মর্ম্মরে তাহার দৃষ্টি বাঁ দিকে পড়িতেই সে মেছুরিয়া বালকদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—

কিরে শরতা, মাছ পেলি? হেই! শালার গরু—

শরতার ছিপে মাছ লাগিবার কেবল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

সে ইঙ্গিতে রাখাল-বালকটিকে কথা কহিতে নিষেধ করিবার জন্য বাঁ হাতটি তুলিল।

গরু দুটি শীর্ণ হইলে কি হয়, বদ্‌মাইসিতে কোনো গরুর চেয়ে কম নয়। একটির তো গলায় উদুখলই দিতে হইয়াছে, তবু কি মানে? কেবলই বিপথে ছোটে। রাখাল-বালক এইটিকে লইয়া ব্যস্ত ছিল, শরতার ইঙ্গিত দেখিতে পায় নাই। গরু দুটিকে মাঠের দিকে নামাইয়া দিয়া সে ছুটিয়া মাছ ধরা দেখিতে আসিল।

—পেয়েছিস্? শরতা?

মাছ বোধ হয় একটা লাগিয়াছিল। কিন্তু রাখালের পদশব্দেই হোক, অথবা তাহার চীৎকারেই হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, মাছটি ছাড়িয়া গেল।

শরতা শূন্য ছিপে একটা খিঁচ দিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, —পেয়েছিস্? শরতা? মারবো শালা ছিপের বাড়ি।

শরতা বলিষ্ঠ নয়, কিন্তু রাখাল আরও দুর্ব্বল। বছর পনেরো বয়স, কিন্তু আট নয় বৎসরের বেশী বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম জার্ম্মান। পেট-জোড়া পীলে, বুকের হাড় গোণা যায়।

শরতার বিঘূর্ণিত লোচন ও উদ্যত ছিপ দেখিয়া জার্ম্মান ভয় পাইয়া গেল। কিন্তু দমিবার ছেলে সে নয়। জিভ বাহির করিয়া ভেংচি কাটিয়া সে মাঠের দিকে ছুট দিল।

মনের গহনে

শরতা হাতের কাছে একটা মাটির ঢিল তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। ঢিল লাগিল না। সে আবার মৎস্য-শীকারে মনোনিবেশ করিল।

ডোবার দক্ষিণ দিক হইতে পায়ে-চলা রাস্তাটি ঢালু হইয়া যেখানে নামিয়াছে, সেইখানটি এ পাড়ার খিড়কীর ঘাট। একটি বর্ষিয়সী বিধবা মহিলা সেখানে আপন মনে বাসন মাজিতেছিলেন। একটি তরুণী বধূ বাঁ হাতে এক কাঁড়ি বাসন লইয়া সেই ঘাটে নামিল। তাহার পিছনে আর একটি বছর তিনেকের খুকী। গায়ে অনেকগুলা সূতী জামার উপর একট জুট-ফ্লানেলের ফ্রক,—ফ্রক ঠিক নয়, একেবারে পায়ের গোছ পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে। তাহার উপর আবার একটা ছোট সাড়ী ভাঁজ করিয়া গায়ের কাপড়ের ভঙ্গিতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বধূটি ডোবার উঁচু পাড়ের একটা পরিচ্ছন্ন রৌদ্রাস্তীর্ণ স্থান দেখাইয়া খুকুকে বলিল,—এই খানে বোস্ সন্তু। ঘাটে নামিস্ না।

সন্তু দুটি হাত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া নাকি স্বরে বলিল,—না।

—লক্ষ্মীটি, বোসো। আমি বাসন মেজেই তোমাকে কোলে নোব, কেমন?

সন্তু বড় ভালো মেয়ে। এবারে সে চুপ করিয়া বসিল। বসিল বটে, কিন্তু সে মায়ের অনুরোধে নয়, ঘাটে যে বর্ষিয়সী মহিলা বাসন মাজিতেছিলেন, তাঁহারই ভয়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে চুপ করিয়া

থাকিতে পারিল না। একটু পরেই গুন্‌গুন্ স্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বর্ষীয়সী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হরিহর এসেছে না কি বৌমা ?

হরিহর কলিকাতায় চাকরী করে। এক শনিবার অন্তর বাড়ী আসে, আবার রবিবার রাত্রের ট্রেণে চলিয়া যায়।

বৌমা সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আসিয়াছে।

—আমাদের সেই ওষুধটা এনেছে নাকি দেখেছ ?

বৌমা অত জানে না। বলিল,—তাতো জানি না জ্যেঠিমা। তবে অনেক জিনিসই তো এনেছে। বোধ হয় আপনারটাও এনেছে।

জ্যেঠিমা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন—তোমার মেয়েটি কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা বৌমা। আর আমাদের লক্ষ্মীমন্ত···

বৌমা হাসিয়া বলিলেন,—ঠাণ্ডা না ছাই। বোধ হয় আপনাকে দেখে অমনি ক'রে রয়েছে। জ্বর হ'য়ে অবধি কি যে ঝুঁকি হয়েছে !

জ্যেঠিমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখনো জ্বর রয়েছে নাকি ?

—এখন তো জ্বর আসে না। আসে বিকেল বেলায়।

—জ্বরের কথা আর বোলো না বৌমা, কি যে ম্যালোয়ারী লেগেছে, ম'রে গেলাম। আমাদের রাখালদাস ক'দিন বেশ ছিল।

মনের গহনে

কাল সন্ধ্যে বেলায় কোথা থেকে বেড়িয়ে এলো, গা একেবারে আগুন। আর কী কাঁপুনী! দু'খানা লেপ চাপিয়েও তার কাঁপুনী যায় না। ম্যালোয়ারী বটে, মা!

—বট্‌ঠাকুর কেমন আছেন এখন?

—জ্বরটা একটু নরম পড়েছে বটে, কিন্তু এখনো ছাড়ে নি। ঝিম্ হ'য়ে পড়ে রয়েছে। তোমাদের বাড়ী তো হাঁসপাতাল।

বৌটি একটু মৃদু হাসিল। বলিল,—পনেরো-ষোলো জন লোক, তার দশ-বারো জন প'ড়ে। সাবু রান্না হয় ডেক্‌চিতে।

জ্যেঠিমার বাসন মাজা হইয়া গিয়াছিল। উঠিতে উঠিতে বলিলেন,—আর বলো কেন, মা। যাবো একবার তোমাদের বাড়ীতে। দেখি গে, ওষুধটা এনেছে কিনা।

জ্যেঠিমা যাওয়া মাত্র সন্তুর গুঞ্জন উচ্চতর হইয়া উঠিল। বধূটি হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ডোবার ধারেই যে বাড়ী, সেই বাড়ীটি মুখুয্যেদের। হরিহরকে মুখুয্যে-বাড়ীর কুলপ্রদীপ বলা চলে। গত বৎসর সে এম-এ পাশ করিয়াছে এবং সৌভাগ্যক্রমে মাস কয়েক পরেই কলিকাতার একটি মার্চেন্ট অফিসে পঞ্চান্ন টাকার চাকুরী পাইয়াছে। মেসে থাকে, বাড়ী যখন আসে কপিতে-আলুতে-মটরশুঁটিতে, কাপড়-চোপড়ে যে জিনিস লইয়া আসে তাহা তিনটি কুলীর বোঝা। দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়।

বাড়ীতেও একটা সমারোহ পড়ে। বধূটির কাজও বাড়ে, হাসিও বাড়ে।

পোষ্যসংখ্যাও তো কম নয়। কিন্তু এবারে সব জ্বরে পড়িয়া। মেজ ভাইটির সতেরো আঠারো বৎসর বয়স। কিন্তু এমন কাবু হইয়াছে যে আর উঠিতে পর্য্যন্ত পারে না। মেজাজও খিটখিটে হইয়াছে। সাগুর নাম শুনিলে চটিয়া যায়। অথচ ম্যালেরিয়ায় সাগু ছাড়া আর কি-ই বা খাইতে দেওয়া যায়!

হরিহরকে সব ভাই-ই অত্যন্ত ভয় করে।

মা বলিলেন,—ওরে হরি, মুরলীর ঘরে গিয়ে একটু বোস্ গে তো। তোকে দেখে যদি একটু সাবু খায়।

হরিহর ঘরের মধ্যে আসিয়া মুরলীর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিল।

—এখন তো জ্বর নেই, দেখ্ছি।

মুরলী ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল,—সকালেই ছেড়ে গেছে। আবার আসবে সেই বিকেল পাঁচটায়।

এমন সময় মা আসিয়া দাঁড়াইলেন সাগুর বাটি হাতে করিয়া।

সকালে মুরলী মায়ের দুটি হাত ধরিয়া সাধিয়াছিল,—আমাকে কই মাছ দিয়ে বাঁধাকপির তরকারী একটু দিও মা, দেবে?

মা বিরক্ত ভাবে বলিয়াছিলেন,—তুই কী রে মুরলী! আজ সকালে জ্বর ছেড়েছে আর এরই মধ্যে বাঁধাকপির তরকারী? তুই যে মস্ত রগু অধম হলি!

মুরলী মিনতি করিয়া বলিয়াছিল,—তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, একটুখানি দিও। আমার অসুখ যখন সারবে, তখন বাঁধাকপিও উঠে যাবে। দেখবে তখন তোমার মন-অসুখ করিবে।

এই কথায় মায়ের মন অনেকটা নরম হইয়াছিল।

তিনি চুপি চুপি বলিয়াছিলেন,—আচ্ছা, সবারই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, আমি তরকারী একটু নিয়ে আসব। কিন্তু আর কোনো-দিন চাইতে পাবে না। বেশ ?

মুরলী পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিল, আচ্ছা।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার রোগীর শত্রু বোধ হয় পদে পদে।

পিসিমা যে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতে-ছিলেন, সে কথা ইহাদের কেহ জানিত না। বিধবা পিসিমা, ছেলেপুলে নাই। এই বাড়ীর তিনিই কর্ত্রী। মায়ের অধিক স্নেহ দিয়া বাড়ীর প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে তিনি মানুষ করিয়াছেন। তিনিও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে দিন চারেক হইল উঠিয়া দুটি পথ্য করিয়াছেন। মা ও ছেলের কথা তাঁহার কানে যাইতেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন,—

—তাই দিও। ছেলেটাকে বাঁচতে যে দেবে না সে তো জানি। আর যত কুপথ্য করবে কি এই ধেড়ে ছেলেটাই !

প্রকাশ্যে কিছু বলিবার সাহস মুরলীর ছিল না। সে মনে মনে বলিল,—ডাইনী !

মুরলীর মা আর কথাটি না কহিয়া তখনই সরিয়া পড়িলেন।

এখন মা ঘরে আসিতেই সে প্রথমটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁর হাতে সাগুর বাটি দেখিয়া মুরলী পাশ ফিরিয়া শুইল। রকম দেখিয়া মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

—খা একটু সাবু।

মুরলী জবাব দিল না।

এবারে হরিহর ডাকিল,—খেয়ে নে, নিয়ে শো। সাবু খাবার সময় হ'লেই যত গোলমাল।

মুরলী যেন সাগুর উপরই রাগ করিয়া, মায়ের হাত হইতে বাটি লইয়া ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া এক নিশ্বাসে সবটা পান করিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

মা মুখ ফিরাইয়া হাসি ঢাকিলেন। হরিহরও পিছন ফিরিল। এতক্ষণে তাহার পাশের বিছানাটির দিকে দৃষ্টি পড়িল।

হরিহর জিজ্ঞাসা করিল,—এটা কোথায় গেল রে? মণ্টুটা?

সাগু খাইলেই মুরলীর বমি আসে। কিন্তু এই প্রশ্নে সে কোনো রকমে বমি চাপিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল,—যাবে আবার কোথায়? রান্না-ঘরেই আছে। সে তো দিন নেই, রাত নেই, রান্না-ঘরেই প'ড়ে আছে। জ্বর কি সারে না সাধে?

হরিহরের খাওয়ার জায়গা করা হইয়াছে। সে এইবার খাইতে আসিবে বুঝিয়া মণ্টু আগে-ভাগেই সরিয়া পড়িয়াছে।

মুরলীর কথা শুনিয়া সে বাহির হইতেই চিঁ-চিঁ করিয়া বলিল,—রান্নাঘরে আবার কখন গেলাম। আমি তো সেই থেকে এইখানে ব'সে আছি।

হরিহর হাসিয়া বলিল,—কই, আমি যখন আসি তখন তো তুই ওখানে ছিলি না।

মণ্টুর বয়স আট নয় বৎসরের বেশী হইবে না। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে কখনো ভাবিতে হয় না।

সে আপন বিছানাটিতে শুইতে শুইতে বলিল,—বা রে! তখন তো আমি পায়খানায়।

মুরলী গোঁ গোঁ করিয়া বলিল,—হুঁঃ! পায়খানায়!

অকস্মাৎ মণ্টু চীৎকার করিয়া উঠিল,—আমার ডিম! আমার কমলা লেবু?

হরিহর বিস্মিত ভাবে বলিল,—ডিম কি রে?

সে কথা কানে না তুলিয়াই মণ্টু চীৎকার করিতে লাগিল,—আর একটা ডিম, আর কমলা লেবু? এই বালিশের নীচে রেখে-ছিলাম যে! নিশ্চয় তুমি নিয়েছ মেজদা। দিয়ে দাও বলছি।

মুরলী ভেংচাইয়া বলিল,--আহা, স্বপ্ন দেখছেন!

মণ্টু কিন্তু এত সহজে ভুলিবার ছেলে নয়। গর্জ্জন করিয়া বলিল,—ইয়ার্কি কোরো না মেজদা। নিশ্চয় তোমার কাজ। লুভিষ্টি কোথাকার!

হরিহর আবার জিজ্ঞাসা করিল,—ডিম কি রে ?

মণ্টু বালিশটা তুলিয়া বলিল,—এইখানেই রেখেছিলাম যে। মোট ছ'টা ছিল তো ? কই ছ'টা ? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচটা। আর একটা গেল কোথায় ?

মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, আর চিলের মতো চ্যাঁচাতে হবে না। আমি দেবো তোকে আর একটা, তা হ'লেই তো হবে।

মাকে চটাইবার সাহস কোনো রোগীরই ছিল না। আর মুরলীর কাছ হইতে হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করাও মণ্টুর সাধ্যাতীত।

সে শুইতে-শুইতে বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল,—তুমি তো সবই দেবে !

মণ্টুর ডিম্ব-সংগ্রহের একটা ইতিহাস আছে। গত তিনমাস ধরিয়া সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। একদিন ভালো থাকে তো দু'দিন জ্বরে ভোগে। তাই ভালো-মন্দ জিনিষ তাহার খাওয়া হয় না। হংস ডিম্বের উপর মণ্টুর বিশেষ প্রীতি আছে। যেদিনই বাড়ীতে ডিম-রান্নার আয়োজন হয়, সে দিনই সে খাওয়ার বায়না ধরে। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার অংশের একটি করিয়া কাঁচা ডিম তাহাকে দেওয়া হয়। সে ভালো হইয়া উঠিলে খাইবে।

এই ডিমের একটি মুরলী চুরি করিয়াছিল,—খাওয়ার জন্য নয় নিশ্চয়ই, মণ্টুকে রাগাইবার জন্যই।

হরিহরের খাওয়ার ডাক আসিয়াছিল। সে চলিয়া যাইতেই মুরলী করুণ কণ্ঠে ডাকিল,—মা!

কিরে?

মুরলী কথা বলিল না। শুধু করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তরকারী? এখুনি ঠাকুরঝি জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না। ক্ষিধে যদি পায়, বরং আর একটু সাবু এনে দোব।

মুরলী রাগিয়া বলিল,—আর সাবু আনতে হবে না। এই সাবু খাওয়াই যেন শেষ সাবু খাওয়া হয়।

মা চটিয়া বলিলেন,—কি বললি?

মুরলী উত্তর দিল না, পাশ ফিরিয়া শুইল। জ্বরে ভুগিয়া-ভুগিয়া মুরলী দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাহার আর কোনো সংশয় নাই। জ্বরে কুপথ্য যে কত খারাপ সে কথা বুঝিবার বয়স তাহার হইয়াছে। তবু ভয় করে না।

বাহিরে তখন হরিহরের সঙ্গে পিসিমার কথা হইতেছিল। হরিহর কি বলিতেছিল শোনা গেল না। কিন্তু পিসিমার ঝাঁঝালো কণ্ঠ কাঁসরের মতো ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল,—

—জ্বর তো কোন্ দিন সেরে যেত। সারছে না শুধু তোর মায়ের জন্যে। যখন যে যা বায়না ধরবে, তাই ওর দেওয়া চাই। কুপথ্যি দিতে ওর একটু ভয় করে না তাই ভাবি। আর তাও বলি,

মণ্টুটা না হয় ছেলেমানুষ, ঝোঁক একটু হয়। কিন্তু তুই একটা ধেড়ে মিন্‌সে, তুই যা তা খেতে চাস কি ব'লে ?

মণ্টু কথা শুনিয়া লেপের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে হাসি শুনিয়া মুরলীর রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

সে চাপা কণ্ঠে মণ্টুকে ধমক দিল,—এই দেখ্ মণ্টু, এক চড়ে দাঁত ভেঙে দোব।

হরিহর খাওয়া শেষ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। নীচে শুইয়া শুইয়াই মুরলী তাহার পায়ের শব্দ শুনিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, হরিহর এতক্ষণ নিশ্চয় দিবানিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে।

আস্তে আস্তে ডাকিল,—মণ্টু !

—কি ?

—ডিম নিবি না ?

মণ্টু উঠিয়া বসিল। বলিল,—দাও।

মুরলী বালিশের নীচে হইতে একটা ডিম বাহির করিয়া দিল।

মণ্টু বলিল,—আর কমলা লেবু ?

—সেটা খেয়ে ফেলেছি।

মণ্টু রাগিয়া বলিল,—তুমি যে একটা রাক্ষস।

মুরলী রাগ করিল না, বরং একটু প্রসন্ন মনেই হাসিল। বলিল,—রান্নাঘর থেকে খুব খেয়ে এলি তো ?

মণ্টু জবাব দিল না।

মুরলী আবার বলিল,—বড়দা কি কি এনেছে রে?

—কমলা লেবু।

—আর?

—কপি, মটরশুঁটি।

—আর কিছু আনে নি?

মণ্টু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

মুরলী বলিল,—বল না।

—কাঁকড়া এনেছে এক হাঁড়ি। চমৎকার!

—কাঁকড়ার নামে মুরলীর জিহ্বা লালাসিক্ত হইয়া উঠিল। সে ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তুই খেয়ে এলি তো?

মণ্টু আবার মুচকি-মুচকি হাসিতে লাগিল।

মুরলী বলিল,—স্বার্থপর কোথাকার! একটা খবরও যদি দেয়!

মুরলী আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করিল না। সে কেবল উঠিতে যাইবে, এমন সময় মা নিজেই আসিয়া তরকারীর বাটী সুমুখে ধরিলেন।

—কাঁকড়া আছে?

—আছে। সে খবরও পেয়েছে?

একটু একটু করিয়া মুরলী তরকারীটুকু পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করিতে বসিল। কিন্তু তাহার কি নিশ্চিন্ত মনে আহার

করিবার যো আছে? আহার শেষ হইতে না হইতে হরিহর একেবারে ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

—ওকি হচ্ছে রে?

তখন আর বাটি লুকাইয়া ফেলিবারও সময় ছিল না। মুরলী বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া শুধু একটু অপ্রতিভের মতো হাসিল। মা বাটিটা আবার তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বিরক্তভাবে বলিল,—থাক্ বাপু থাক্। তুই আর বাধা দিস্‌নে।

হরিহর বিস্মিত ভাবে বলিল,—তুমি বলো কি! কাল ওর একশো পাঁচ জ্বর, আর আজ ওকে ওই সব দিচ্ছ? কাঁকড়া ও হজম করতে পারবে?

—খুব পারবে। ও কি বেশী খাচ্ছে নাকি?

হরিহর বিরক্ত ভাবে বলিল,—যা মন চায় তাই করো।

—তাই করব। তুই সর্ দেখি! বেচারাকে মুখের খাবার খেতে দিচ্ছিস্ না।

কিন্তু মুরলী আর বাটি স্পর্শও করিল না। মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

গোলযোগ দেখিয়া পিসিমাও দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার তখনও আহার হয় নাই।

তিনি বলিলেন,—জ্বরের মুখে ওই সব যে ওকে খাওয়াচ্ছ বৌ, ওকে কি বাঁচতে দেবে না?

মায়ের মেজাজ চটিয়াই ছিল। বলিলেন,—খুব বাঁচবে। একটুখানি তরকারী খেলে আর মানুষ মরে না।

পিসিমা শান্তভাবে বলিলেন,—সে সহজ মানুষ মরে না। কিন্তু ওর গায়ে এখনও জ্বর আছে। ওর কাছে ও যে বিষ! রোগীর কাছে মা হ'লে চলে না, শত্রু হ'তে হয়।

হাতের বাটিটা ছুঁড়িয়া বাহিরের নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া মা বলিলেন,—তবে এই নাও। হ'ল তো!

রাগে তাঁহার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। তিনি হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মণ্টু এতক্ষণ বেশ মজা দেখিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারও মন মেজদাদার প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার তখন জ্বর আসিতেছে, একটু কাঁপুনিও দেখা দিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল,—আর তুমি যে দিব্যি কদ্‌বেল বসাচ্ছ!

হরিহর বিস্মিত ভাবে বলিল,—কে রে?

—ওই পিসিমা।

পিসিমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন,—কে রে? আমি? শোনো ছেলের কথা!

মণ্টু বলিল,—তোমার ঘরে দেখলাম যে! মাখা রয়েছে একটা পাথর-বাটিতে।

পিসিমা বলিলেন,—কখন দেখ্‌লি রে হতভাগা?

হরিহর বলিল,—বুঝতে পেরেছি। চল তোমার ঘর দেখি গে!

হরিহরকে বেশী খুঁজিতে হইল না। একটা কোণে একটা শ্বেত-পাথরের বাটিতে কদ্‌বেল সত্যই মাখা, অতি সহজেই পাওয়া গেল।

বাটিটা হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া হরিহর বলিল,—এটা কি?

পিসিমা ধরা পড়িয়া চটিয়া গেলেন। বলিলেন,—বেশ করব, খাবো। বিধবা মানুষ, টক খাবো না, কিছু খাবো না, তো খাবো কি দিয়ে?

—আমার মাথা দিয়ে খাবে। আজ সকালের ওষুধ খেয়েছ?

পিসিমা ন' বছরের দুরন্ত জেদী মেয়ের মতো ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন,—না বাপু, ওই তেতো ওষুধ আমি খেতে পারবো না।

হরিহর রাগিয়া বলিল, তবে টক খাও, খেয়ে মর।

এবারে পিসিমা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—ওরে, আমি মরবো না রে, মরবো না। বিধবা হওয়ার পরেও যখন ত্রিশ বছর বেঁচে আছি, তখন টক খেলেও মরবো না, ওষুধ না খেলেও মরবো না।

এ বড় মন্দ যুক্তি নয়! যে মানুষ বিধবা হওয়ার পরেও ত্রিশ বৎসর কাল বাঁচিয়া রহিল, সে নিশ্চয় অমর। নহিলে বৈধব্যশোকে বহুকাল পূর্ব্বেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইত। তা যখন হয় নাই।

তখন তাহার পক্ষে যে-কোনরূপ কুপথ্য-ভোজন অনায়াসেই চলিতে পারে।

কিন্তু হরিহর শুধু বিস্মিত হইয়া ভাবিল, ছেলেদের এতটুকু অনিয়মে যিনি ব্যস্ত হইয়া উঠেন, জীবনের প্রান্তে আসিয়া তিনি নিজে এমন অনিয়ম করেন কি বলিয়া? ত্রিশ বৎসর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সকল প্রকার সুখ-বিলাস যিনি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন, তিনি যে আজ সামান্য কদ্‌বেলের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ইহার চেয়ে আশ্চর্য্যের আর কী হইতে পারে?

শনি রবি সোম

মনের গহনে

এবারে বর্ষার প্রকোপটা কিছু বেশী। গত শনিবারে বৃষ্টি নামিয়াছে, আর এক শনিবার শেষ হইতে চলিল, কিন্তু বৃষ্টির আর বিরাম নাই। পল্লীগ্রামে কাদা তো আছেই। কিন্তু এই ঝম্ ঝম্ শব্দ যেন আরও পাগল করিয়া তুলিল। মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সোনাটিকুরীর বিল বানগ্রামের কোল পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে। দিগন্তপ্রসারী মাঠে যত দূর দৃষ্টি যায়—কেবল জল, জল, জল, বানের গেরুয়া জল। মাঝে মাঝে যে সকল বড় বড় গাছের মাথা জাগিয়া আছে, কেবল তাহা দেখিয়াই অনুমান করা চলে, কোন্‌টা নতুন পুকুরের চক আর কোন্‌টা বামুনহাটির মাঠ।

কিন্তু ট্রেণ বর্ষা মানে না। একমাত্র ভূমিকম্প ছাড়া আর কোনো দুর্য্যোগেই বোধহয় ভয় পায় না। শনিবারের লোকাল ট্রেনখানি ঠিক আটটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময় গ্রামের ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

দুর্যোগের রাত্রি। যেমন দুর্যোগ, তেমনি অন্ধকার। প্লাটফর্ম্মে গোটা কয়েক আলো জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তা এত দূরে দূরে এবং বৃষ্টির ছাটে এমন ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে যে, অন্ধকার খুব সামান্যই কমিয়াছে। এ ট্রেণে চড়িবার জন্য একখানা টিকিটও বিক্রি হয় নাই। রাত্রের অবস্থা দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার আশা করেন, এখানে নামিবার যাত্রীও কেহ নাই। সুতরাং ভারী বর্ষাতিটা গায়ে দিয়া এবং হাতে একটা রেলের বাতি লইয়া কোনো রকমে গাড়ীখানাকে

মনের গহনে

পত্রপাঠ বিদায় করিবার জন্য ভদ্রলোক হন্ হন্ করিয়া ছুটিতেছেন, এমন সময় সামনের থার্ড ক্লাশ হইতে নামিল দুইটি কাপড়ের পুঁটলি, একটি প্রজ্বলিত হারিকেন এবং একটি ভদ্রলোক। পুঁটলি দুইটির অবস্থা মলিন। হারিকেনে এত কালি পড়িয়াছে যে, বড় জোর সেই-টাকে দেখা যায়, পার্শ্ববর্ত্তী আর কিছু নয়, এবং সেই স্বল্পালোকে স্পষ্ট করিয়া দেখা না গেলেও বোঝা যায়, ভদ্রলোকর অবস্থাও উক্ত অস্থাবর বস্তু কয়টি অপেক্ষা আশাপ্রদ নয়।

ষ্টেশন-মাষ্টারকে দেখিয়াই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ে,··· আমাদের রতন আসেনি মাষ্টার মশাই ?

বলিয়া ছাতাটা মেলিয়া মাথায় ধরিলেন। ছাতার আদিম কালো কাপড়ের উপর আর একটা শাদা কাপড় বসানো হইয়াছে। মাঝে মাঝে ফুটা, বোধ হয় বিড়ি-সিগারেটের কাণ্ড। শ্বেতছত্র বর্ষার ধারা নিবারণ করিতে না পারিয়া যেন ক্রোধবশে পর্জ্জন্যদেবকে ভেঙচাইতে লাগিল।

ভদ্রলোকের অনুনাসিক, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মাষ্টার মশাই প্রথমটা চমকাইয়া গেলেন। কিন্তু হাত-বাতির আলোটা তাঁর মুখের উপর ফেলিয়া তখনই বলিলেন, আরে! দত্ত মশাই যে! খিলক্ষণ! এই দুর্য্যোগেও বেরিয়েছেন ?

—দুর্য্যোগ মানে,···ইয়ে! আমাদের রতন···

কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টারের তখন দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সময় নাই।

মনের গহনে

হাত-ইসারায় দত্ত মহাশয়কে ষ্টেশনে উঠিতে বলিয়া তিনি ট্রেণ পাস্ করিবার জন্য গার্ডের গাড়ীর দিকে ছুটিলেন। দত্ত মহাশয় পুঁটলি দুইটা হাতে করিয়া অর্দ্ধসিক্ত অবস্থায় ষ্টেশনে আসিয়া উঠিলেন।

ষ্টেশন-ঘরের উজ্জ্বল আলোয় এতক্ষণে দত্ত মহাশয়কে ভাল করিয়া দেখা গেল। দেখিলে মনেই হয় না, ইনি জার্ম্মোলিন লিমিটেডের একটা ছোট বিভাগের বড়বাবু। অত্যন্ত শীর্ণ দেহের উপর একটা বর্ত্তুলাকার শীর্ণ মাথা এমন আল্‌গোছে বসান যে, কেহ একটা কথা কহিলেই সেটা ঢেউ-লাগা কলসীর মত দুলিতে থাকে। এইটুকু তো মাথা। তাহারও তিন-চতুর্থাংশ স্থান একটি বিপুল নাসিকা একাই দখল করিতেছে। বাকী এক-চতুর্থ স্থানে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া কোনো প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া, নিতান্তই ভগবানের রাজ্য বলিয়া টিঁকিয়া আছে।

প্লাটফর্ম্ম হইতে এইটুকু আসিতেই দত্ত মহাশয় ভিজিয়া গেলেন। গায়ে একটি মাত্র লংক্লথের পাঞ্জাবী। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সেটা গায়ের সঙ্গে ল্যাপটাইয়া গিয়াছে। জোলো হাওয়ায় ভদ্রলোক ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। করিবার মত কোন কাজ হাতের কাছে না পাইয়া, দত্ত মহাশয় বিরলকেশ মাথাতেই হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মাষ্টার মহাশয় দুম্ দাম্ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভারী বর্ষাতিটা ডান দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আর মাথার বর্ষাতি টুপিটা বাঁ দিকে।

তারপর একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, তারপরে ? দত্ত মশাই ? এই দুর্য্যোগেও বেরুলেন ?

মাষ্টার মহাশয়ের যেমন কলেবর তেমনি কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে আর সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর কানে প্রবেশ করে না, এত ক্ষীণ মনে হয়। সে ক্ষেত্রে দত্ত মহাশয়ের তো কথাই নাই।

তিনি ঠাণ্ডায় কাঁপিতে কাঁপিতে কোন প্রকারে বলিলেন, ইয়ে···! আর বলেন কেন মশাই! আমার হয়েছে·· হুঁঃ! সবাই বললে, ঘরে চাষ করুন। তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মাণি। সেই ঝঞ্ঝাট!

মাষ্টার মহাশয় অট্টহাস্যে ষ্টেশন-ঘর কাঁপাইয়া বলিলেন, বিলক্ষণ! এই বাজারে ঘরে চাষও করবেন না কি ?

সে হাসির দমকে দত্ত মহাশয়ের মাথাটা দুলিয়া উঠিল। টানিয়া টানিয়া বলিলেন, আর বলেন কেন মশাই ? ঘরে চাষ, তাও একটি-মাত্র মোষ পাওয়া গেছে। আর একটা···হুঁঃ!

—আর একটা কি হ'ল বললেন ?

—হবে আবার কি ? সে এখনও হাটে।

মাষ্টার মহাশয় আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

—হাটে কি মশাই! সেটা কি সেইখান থেকেই চাষ করবে না কি ? বিলক্ষণ!

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দত্ত মহাশয় বলিলেন, গতিক

সেই রকমই। বর্ষা পড়ে গেল। লোকের অর্দ্ধেক জমি আবাদ হ'য়ে গেল। আর আমি ওই আধখানা মোষ নিয়ে কি করি বলুন তো!

—মোষ কি আর পাওয়া যাচ্ছে না?

—কি ক'রে বলব মশাই! এক একবার আসি, আর এক এক রকম···হুঁ। কিছুই বুঝি না।

দত্ত মহাশয় হতাশভাবে হাত নাড়িলেন।

টেলিগ্রাফের কলটা বাজিয়া উঠিতেই মাষ্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিলেন। বলিলেন, যাকগে। ভিজে কাপড়ে আর ব'সে থাকবেন না। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছেন যে!

দত্ত মহাশয় সর্ব্বাঙ্গ নজর করিয়া দেখিলেন, সত্যই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন কিনা। দেখিলেন, কাঁপিতেছেন বটে। গল্প করিতে করিতে বাড়ী যাওয়ার কথাটাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। চমক ভাঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রতনের কথাটাও মনে পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিলেন,···ইয়ে আমাদের রতন আসে নি মাষ্টার মশাই?

মাষ্টার মহাশয় টকাটক্ টেলিগ্রাফটা সারিয়া বলিলেন, রতন? আপনাদের সেই চাকরটা?

—হ্যাঁ? হ্যাঁ? কালো মতন···

মনের গহনে

—ক্ষেপেছেন মশাই ? সে আসবে এই ঝড় বৃষ্টিতে ? আপনার যা বাবু চাকর ! দিন রাত্রি গায়ে ফুঁ দিচ্ছে।

দত্ত মহাশয় দুই হাতে দুটি পোঁটলা তুলিয়া লইয়া বিব্রত ভাবে বলিলেন, তাইত ! আলোটা ?

অর্থাৎ দুইটা হাতই বন্ধ, আলোটা কি করিয়া লইয়া যাইবেন ? তার উপর একটি ছাতাও আছে।

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, পোঁটলা দুটো বরং রেখে যান। কাল সকালে আপনার রতনকে পাঠিয়ে দেবেন। সে নিয়ে যাবে।

হাঁফ ছাড়িয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন,···ইয়ে, সেই ভাল। সব হয়েছে···হুঁঃ !

শ্বেতছত্র মাথায় দিয়া দত্ত মহাশয় সেই দুর্যোগে ষ্টেশন হইতে নামিলেন।

ষ্টেশন হইতে দত্ত মহাশয়ের বাড়ী মিনিট পনেরোর পথ। ষ্টেশন হইতে লাইন ধরিয়া খানিকটা গিয়া, বাঁয়ে আল ভাঙ্গিতে হয়। ও দিক দিয়া একটা কাঁচা সড়কও আছে বটে, কিন্তু সে অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়। ওটা গরুর গাড়ীর রাস্তা। সহজ হয় বলিয়া যাহারা হাঁটিয়া যায়, তাহারা সাধারণতঃ এই আল-পথ দিয়াই যায়।

সোনাটিকুরীর বিল গ্রামের ওধারে। এধারে বান আসে নাই বটে, কিন্তু যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই মাঠ ভাসিতেছে। সরু

আল। কোথাও দেখা যায়, কোথাও যায় না। ধূম-মলিন হারি-কেনের আলো যে সাহায্য করিতেছে তাহা অতি সামান্য। ও দিকে ভাঙা ছাতা দিয়াও অজস্র ধারায় জল পড়িতেছে। দত্ত মহাশয় কাপড় হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত বেশ সামলাইয়া পরিয়া আন্দাজে আন্দাজে পা টিপিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। চাষীরা জমির জল-নিকাশের জন্য মাঝে মাঝে আল কাটিয়া দিয়াছে। সে দিক দিয়া প্রবল স্রোতে জল নামিতেছে। দত্ত মহাশয় সেই সব জায়গায় একটু থামিয়া হিসাব করিয়া পার হইতেছেন।

মাঝে মাঝে খালে পা পড়ায় দত্ত মহাশয় উল্টাইয়া পড়িতে-ছেন। কোথাও বা পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইতেছেন। বড় জোর ছাতাটা ছিটকাইয়া পড়িতেছে। এমনি একটা দুর্ঘটনায় মধ্যপথে আলোটা নিভিয়া গেল। দত্ত মহাশয় কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়' দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে নির্ব্বাপিত আলোটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পকেটে দেশলাই ছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজিয়া অকেজো হইয়া গিয়াছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখের সম্মুখে নিজের হাতখানাই দেখা যায় না। চারিদিকে গ্যাঙোর গ্যাং শব্দে ব্যাঙ ডাকিতেছে। কিন্তু এই দারুণ দুর্যোগে, জনশূন্য প্রান্তরে মত্ত দাদুরী সম্বন্ধে দত্ত মহাশয়ের কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না। বরং দূরে কোথায় একটা গো-সাপ এমন ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে যে, ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া

গেল। বিষধর সাপের ভয়ও যথেষ্ট, কিন্তু উপায় কি? এই মধ্য-পথ হইতে ফিরিয়া যাওয়াও যা, আগাইয়া যাওয়াও তাই। তাছাড়া দত্ত মহাশয় বাহিরে যেরূপ নির্জ্জীব, ভিতরেও সেইরূপ নিস্পৃহ। জীবন এবং মৃত্যু উভয়ের সম্বন্ধেই সমান উদাসীন।

তথাপি তাঁহার রতনের উপর রাগ হইল। লোকটার আসা উচিত ছিল। অবশ্য এই জল এবং কাদা ভাঙিয়া পথ হাঁটিবার যে দুঃখ, সে তো আছেই। রতন কিছু তাঁহাকে কাঁধে করিয়া পার করিত না। তবু এমন একলা তো চলিতে হইত না! কথা বলিবার একজন লোক তো পাওয়া যাইত!

গো-সাপটা সমানে গর্জ্জন করিতেছে। তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়া কয়েকটা ব্যাঙ টুপ্ টুপ্ করিয়া নীচের জলে লাফাইয়া পড়িল। বাঁ দিকের লোকাল-বোর্ডের রাস্তার কাল্‌ভার্ট হইতে হুড়্ হুড়্ শব্দে জল নামিতেছে। তবে ভরসার কথা এই যে, পনেরো মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা লাগিলেও রাস্তা ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে। গ্রামের কোলে এখানে-ওখানে-সেখানে প্রায় একশ'টা আলো দেখা যাইতেছে। বেশী দূরে নয়। সেই আলোতে অবশ্য মানুষগুলিকে চেনা না গেলেও, তাহাদের চলাফেরা দেখা যাইতেছে, এবং উল্লাসের চীৎকারও শোনা যাইতেছে।

আর একটু আগাইতেই দত্ত মহাশয় তাহাদের কাছে আসিয়া পড়িলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! দত্ত মহাশয় কবি নন, তবু এক

মিনিট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন। মাথায় মাথালি, পরণে একখানা করিয়া গামছা, মালসাট মারিয়া পরা, ছোট বড়-মাঝারি নানা আকারের কৃষ্ণবর্ণ দেহ, এক একখানা পলুই হাতে লইয়া মহানন্দে ব্যাঙের মত লাফাইয়া বেড়াইতেছে। আর মাঠের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত শতখানেক আলোর মালা। লোকগুলা 'পাউষে' মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের মনে হইল, দেরী যা হইবার হইয়াছে। ভিজারও চূড়ান্ত হইল। এই পথে একবার সাতবিঘার বাকুড়িটা ঘুরিয়া নিজের ডহরের বড় আড়াটা দেখিয়া গেলে মন্দ হয় না।

আড়াটা বড়। সব্‌জিপুকুরের জল বাঁধ ছাপাইয়া ডহরে পড়ে। বাঁধের গায়েই আড়া, বেশ ভাল মাছ পড়ে। নিজস্ব আড়া। কড়া-ক্রান্তির অংশীদার নাই। সেজন্য একটা কই, কি দু'টা মাগুর মাছ লইয়া ফৌজদারী বাধে না। ঠুক্ ঠুক্ করিয়া দত্ত মহাশয় সেখানে গিয়া দেখিলেন, রতন লাঠি হাতে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার দুইটা ছেলে দুই খালুই মাছ লইয়া বাড়ী যাওয়ার উপক্রম করিতেছে। অন্ধকারে দত্ত মহাশয়ের আগমন তাহারা টের পায় নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে পড়িয়া ভয়ে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এত কাছে যে, খালুই লুকাইবারও উপায় নাই।

খানিকটা পিছনেই রতন আলোর সামনে বসিয়া আড়া

পাহারা দিতেছে। সম্মুখে আলো থাকায় দত্ত মহাশয়কে চিনিতে পারিল না। অন্য কেউ ভাবিয়া গম্ভীর মেজাজে হাঁকিল, কে রে বঙ্কা? দাঁড়ালি কেন?

বঙ্কার উত্তর দিবার শক্তি নাই। কিন্তু দত্ত মহাশয় তাহাদের যেন দেখিয়াও দেখিলেন না, এমনি ভাবে পাশ কাটাইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, রতন নাকি?

মনে মনে রতনও শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দত্ত মহাশয়কে তাহার চিনিতে বাকী নাই। লাফাইয়া উঠিয়া সাগ্রহে বলিল, বড় বাবু? অন্ধকারে যে?

অন্ধকারের কথাটা বড় বাবু নিজেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হাতের নির্ব্বাপিত হারিকেনের দিকে চাহিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে বলিলেন, হাওয়ায় নিভে গেল।

রতন গড় গড় করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, তাইতো বলছি, বড় বাবু ঠিক আসবেন। মা ঠাকরুণকে বললাম, ষ্টেশনে যাই। তা মা ঠাকরুণ বললেন, হ্যাঁ, এই দুর্য্যোগে আবার মানুষ আসে। তুই বরং আড়ার কাছে দাঁড়াগে! লোকের তো ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই। আড়ার মাছ শেষ ক'রে ছেঁকে নিয়ে যাবে। তাই এই দিকে এলাম। কিন্তুক, আমার মন বলছিল···আসতে বড় কষ্ট হয়েছে তো! একটা আলোও নেই।

লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীনতা, কিংবা পথের কষ্ট সম্বন্ধে দত্ত

আচমন সারিয়া তিনি উপরে গেলেন। তিনটি ছেলেতেই অতবড বিছানায় এমনভাবে শুইয়া আছে যে, আর একটা মানুষের শোয়ার স্থান নাই। দত্ত মহাশয় প্রত্যেকের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। সকলেই ভাল আছে দেখিয়া সন্তোষ সহকারে একটি "হুঁ" ছাড়িলেন। রান্না-ঘরের কাজ শেষ করিয়া ইতিমধ্যে গৃহিণীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকাকড়ি এনেছ ?

—টাকা·· হুঁঃ !

কিন্তু এই দুটি কথা বলিতে দত্ত মহাশয় যতখানি সময় লইলেন, ততক্ষণে গৃহিণী তাঁহার পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়াছেন।

—মোটে তিনটি ? কি হবে এতে ? গয়লাকে একটা টাকা দিতেই হবে। ধোপাকে আট আনা না দিলেই হবে না। বাকী রইল দেড়টি টাকা। তা পরাণ মুদি কি দেড় টাকায় ছাড়বে ?

দত্ত মহাশয় একটু থামিয়া টানিয়া টানিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, তিনটে মানে···ইয়ে। যাবার ট্রেনভাড়া রইল না আর কি ! ও তিনটে···হুঁ !

অর্থাৎ ওই তিনটি টাকাই তাঁহার সম্বল। ও টাকা লইলে তাঁহার ফিরিবার ট্রেনভাড়া পর্যন্ত থাকিবে না।

গৃহিণী টাকা তিনটি বাক্সে তুলিয়া ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন,

ট্রেন ভাড়া রইল না মানে? তুমি কি যাওয়া-আসার টিকিট ক'রে আসনি? আমাকে ন্যাকা বোঝাচ্ছ?

গৃহিণীর উষ্মায় দত্ত মহাশয় ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার স্বাভাবিক নিম্নস্বর নিম্নতর অনুনাসিকে পরিণত হইল। কোন প্রকারে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, যাওয়া-আসা মানে···হুঁঃ! মেম সায়েবকে বললাম, তা··

গৃহিণী ধমক দিলেন, থাক্, থাক্।

দত্ত মহাশয় চুপ করিলেন। গৃহিণী ওদিকে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। মিনিট পনেরো পরে দত্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শরীর ভাল আছে তো?

গৃহিণী পিছন ফিরিয়াই বলিলেন, না।

উদ্বেগে দত্ত মহাশয় খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন। শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আবার হ'ল?···ইয়ে, জ্বর?

—ইয়ে, জ্বর, নিউমোনিয়া, কলেরা, বসন্ত, ইয়ে···

দত্ত মহাশয়ের ছোট মাথাটি ঢেউ-লাগা কলসীর মত দুলিতে লাগিল। আশঙ্কায় নয়; গৃহিণী যে পরিহাস করিতেছেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আবার শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, তাই হোক। আমি ভেবেছিলাম,···হুঁ।

গৃহিণী বলিলেন, হুঁ! আর ভাবতে হবে না। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শোও দিকি!

দত্ত মহাশয় উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া স্বস্থানে শুইয়া পড়িলেন; এক মিনিটের মধ্যে তাঁহার নাসিকাধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।

চাটুযোদের বড় গিন্নি দিয়াছিলেন এক শিশি 'পাইরেক্স' আনিতে। তাঁহার বড় নাতি ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া কাঁটাখানি সার করিয়াছে। বছর দুই ধরিয়া ভুগিতেছে। বয়স ষোল বৎসরের কম নয়, কিন্তু দেখিলে নয়-দশ বৎসরের বেশী বলিয়া মনে হয় না। সকালেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঘোষেদের ছোট বৌ দিয়াছিল 'উল্' আনিতে। তাহার বছর দশেকের ভাসুরঝি আঁচলে করিয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে হাজির। গৃহিণী পুঁটলি খুলিয়া তাহার জিনিষগুলি বাহির করিয়া দিলেন।

একটু পরেই দত্ত মহাশয় ঠুক ঠুক করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার মা তখন চাটুযো-গিন্নীর কাছে পুত্রের গুণপণা শতমুখে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। একালে অমন মাতৃভক্ত পুত্র যে নিতান্ত দুর্লভ, এ বিষয়ে চাটুযো গিন্নীর অণুমাত্র সংশয় ছিল না। তিনি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেছিলেন, এবং পুত্রের যে সব কাহিনী মাও ভুলিয়া যাইতেছিলেন, সে সব স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন।

দত্ত মহাশয় নামিয়া আসিলেন।

চাটুয্যে-গৃহিণী মুখখানি বিকশিত করিয়া বলিলেন, এই যে বাবা, ভাল ছিলে তো? তাই বলছিলাম তোমার মাকে। ধন্যি তোমার কোঁক বোন, অনেক তপিস্যে ক'রে ছেলে পেয়েছিলে! বেঁচে থাক বাবা, আমার মাথায় যত পাকা চুল, তত বৎসর পেরমাই হোক। বৌমা আমার জন্ম-এয়োস্ত্রী হ'য়ে স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর করুন।

বৌমার সম্বন্ধে চাটুয্যে-গিন্নীর ভয় ছিল। নাতির ঔষধটা আসিয়াছে বটে, কিন্তু টাকাটা দেওয়া হয় নাই। দত্ত মহাশয় হয়ত তাগাদা করিবেন না, কিন্তু গৃহিণী সাতবার লোক পাঠাইয়া টাকাটা আদায় করিয়া লইবেন। সুতরাং তাঁহাকেও খুশী করার প্রয়োজন।

তিনি একখানা চওড়া লালপাড় মটকার শাড়ী পরিয়া ছেলেদের জন্য মুড়ি বাহির করিয়া দিতেছিলেন। সেদিকে একটা কলরব উঠিয়াছে। আজ মুড়ির পরিমাণ অন্যদিন অপেক্ষা বেশী। মিত্র-বাড়ীর ছোটবৌমার একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে। বড় ঘটা করিয়া তাহার অন্নপ্রাশন হইবে। অন্যান্য আরও পাঁচটি স্বজাতীয়া মহিলার সঙ্গে দত্ত-গৃহিণীকেও এখনই রান্না করিতে যাইতে হইবে। পল্লীগ্রামে উড়িয়া ব্রাহ্মণের এখনও অভ্যুদয় হয় নাই। বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ বাড়ীতে তো নয়ই। দত্ত-গৃহিণী ভোরেই স্নান সারিয়া একবার সেখানে দর্শন দিয়া ছেলেমেয়েদের জলখাবার

দিবার জন্য আসিয়াছেন। আবার এখনই বাহির হইয়া যাইবেন। তাঁহার বড় তাড়াতাড়ি।

দত্ত মহাশয় নম্রকণ্ঠে চাটুয্যে-গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর সব ভাল তো, খুড়িমা ?

—আর ভাল বাবা! নাতিটার জ্বর তো এই দু'বছরের মধ্যে কিছুতে ছাড়ছে না। কত ওষুধ খাওয়ালাম, বাবার থানে কত মানসিক করলাম, কিছুতে কিছু না।

দত্ত মহাশয় গাড়ুটা লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। খবর ভাল নয় শুনিয়া বিব্রতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। বিব্রতভাবে বলিলেন, তাইত··· ইয়ে, রজনী ডাক্তারকে···

—কত ডাক্তার দেখালাম বাবা। ডাক্তার-বদ্যি আর বাকী রাখিনি।

তবু জ্বর ছাড়িল না? দত্ত মহাশয় গাড়ুহাতে অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অবশেষে জ্বরের কোনই কিনারা করিতে না পারিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তখনই ফিরিয়া আসিয়া রান্না-ঘরের ছাচতলায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, একটু তেল দিও তো। এই সঙ্গে একটা···হুঁঃ!

দত্ত গৃহিণী তেলের বাটিটা স্বামীর কাছে নামাইয়া রাখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, এই সাত-সকালে তেল মেখে কি হবে ?

—সাত সকালে মানে···ইয়ে। বিলের জমিটা একবার···হুঁ:, সেই সঙ্গে নদীর ঘাটে একটা···হুঁঃ!

দত্ত-গৃহিণী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, সেই সঙ্গে আমার মাথাতেও একটা...হুঁ। বেশী দেরী ক'র না যেন, মিত্রিবাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে।

দত্ত মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, না। যাব আর আসব। শুধু বিলের জমিটায়···

দত্ত মহাশয় তেল মাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চাযের সঙ্গে সঙ্গে বিলে বিঘা কয়েক জমি বন্দোবস্ত করার কথাও উঠিয়াছে। কতদূর পর্য্যন্ত বান আসে, নিজের চোখে তাহা পরীক্ষা করিয়াই বন্দোবস্ত পাকা করিবেন, সকাল বেলায় এইরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হইয়া ছিল। স্থির করিয়াছেন, এই সঙ্গে তেলটা মাখিয়া গেলে আসিবার সময় নদীর ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসা যায়, তাহাতে অনেকটা সময় অপব্যয়ের হাত হইতে বাঁচিবে।

দত্ত মহাশয়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া সোজা পূর্ব্বমুখে নদীর দিকে খানিকটা গেলেই বড় অশথতলা। গ্রামের লোক চাঁদা তুলিয়া তাহার নীচে বেশ উঁচু করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে। গ্রামের যত নিষ্কর্ম্মা মাতব্বর ব্যক্তি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানে বসিয়া তাস-পাশা-দাবা খেলেন, এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খরসান তামাক পুড়ান। দত্ত মহাশয় প্রথমে সেইখানে

আট্কাইয়া গেলেন। সপ্তাহ পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, একটু ইচ্ছা করিতেই হইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বিলের জমি লওয়ার সম্বন্ধে দত্ত মহাশয় অভিজ্ঞ বন্ধুদের সঙ্গে কেবল আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় দূরে দেখা গেল, একটা লোক কতকগুলি মহিষ তাড়াইয়া লইয়া আসিতেছে। দত্ত মহাশয় পাশের লোকটিকে টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখতো হে মহিন্দির, পাইকের ব'লে মনে হচ্ছে না ?

মহিন্দির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, পাইকেরই বটে। উলোপাড়ার হাটে যাচ্ছে। তোমার একটা মোষ দরকার, না ?

উলাপাড়ার হাটে যাইবার এই রাস্তা। পাইকার কাছে আসিতে তাহাকে থামানো হইল। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মহিষের শিং টানিয়া, দাঁত দেখিয়া এখান-ওখান টিপিয়া মহিষ পছন্দ করিতে লাগিল। দত্ত মহাশয় তাহাদের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চাহিতে লাগিলেন। বিচক্ষণেরা একটা মহিষ পছন্দ করিল। মহিষটা ভাল ; সবে চার দাঁত। এটা হইলে দত্ত মহাশয়ের মহিষটার সঙ্গে জোড়া মেলে ভাল।

কলিকাটা হুঁকা হইতে নামাইয়া দিয়া মহিন্দির বলিল, তোমার মোষের দর কি রকম হে, পাইকের ? বল দেখি শুনি।

—ঠিক একদর বলব ?

দত্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক দর। দর-দস্তুর আমি পছন্দ করি না।

কলিকাটা হাতে ধরিয়া দু'টা টান দিয়া পাইকার বলিল, ছোটটা নেবেন তো ?

—ছোটটাই নোব, কি বল মহিন্দির ?—বলিয়া দত্ত মহাশয় মহেন্দ্রের দিকে তাকাইলেন।

মহেন্দ্র পাকা লোক। কোন্‌টা লওয়া হইবে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে চাহিল না। বলিল, সব কটারই দর শুনি। আচ্ছা, ছোটটারই আগে বল।

কলিকায় বেশ করিয়া একটা শোঁ-টান দিয়া পাইকার কলিকাটা নামাইয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। একটু পরে বলিল, একদর বলছি,—এক কুড়ি আট টাকা। এক আধলা কম দোব না।

মহেন্দ্র বিজ্ঞের মত উপেক্ষাভরে হাসিয়া নিঃশব্দে হুঁকায় মন দিল। পাইকারের কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। দত্ত মহাশয় একবার মহেন্দ্রের একবার পাইকারের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেহই কোন কথা কহে না দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে নিজেই আগাইয়া আসিয়া বলিলেন,—ইয়ে! আটাশ—ফাটাশ বুঝি না। ন'টি টাকা…হুঁঃ !

এবারে মহেন্দ্র এবং পাইকার দুজনেই অবাক হইয়া গেল।

মহেন্দ্র অনুমান করিয়াছিল বাইশ টাকায় লওয়া যায়। পাইকারও আঁচিতেছিল চব্বিশ টাকা বলিলে দিয়া দিবে। এবারে মহিষের বাজার নাই। খড়েব অভাবে লোকে মহিষ বিক্রি করিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সে জায়গায় একেবারে নয় টাকা!

পাইকার আর দাঁড়াইল না। বেশ ক'য়েছেন কর্‌তা, বলিয়া মহিষ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। পিছনে পিছনে দত্ত মহাশয়ও গাড় হাতে চলেন। নয় হইতে দশ, এগারো, সাড়ে এগারো পর্য্যন্ত উঠিলেন, পিছনে পিছনে মাইল দেড়েক আসাও হইল, কিন্তু পাই-কারের মন তথাপি দ্রব হইল না। লোকটা মহেষের পিঠে দুইটা বাড়ি দিয়া বলিল, আর কতদূর আসবেন কর্‌তা? ফিরে যান। এবারে ছাগল দিয়ে চাষ করুন। মোষ কেনা আপনার কম্ম নয়।

নিরাশ হইয়া দত্ত মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গ্রামে নয়, মাঠে মাঠে একেবারে বিলে।

ভাল বান আসিয়াছে। এখনও হু হু করিয়া বাড়িতেছে। যে জায়গাটা দত্ত মহাশয়ের লওয়ার কথা, তার অনেকখানি বন্যার গর্ভে। কিন্তু ঠিক সমস্তটা পর্য্যন্ত বান আসে কিনা, না দেখিয়া পাকা বন্দোবস্ত করা কাজের কথা নয়। দত্ত মহাশয় গামছাটা মাথায় দিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক আঙুল বান বাড়ে, তিনি এক আঙুল পিছাইয়া আসেন। আবার এক আঙুল বাড়ে, আবার এক আঙুল পিছান। এমনি করিয়া যখন বেলা চারটা কি

সাড়ে চারটা, তখনও দেখা গেল বিঘা দশেক জমিতে বান আসিতে বাকী আছে।

এমন সময় রতন হাঁকাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল, বড় বাবু, আপনি এখানে? আমি পিরথিমীটা খুঁজে এলাম।

বলিয়া হাত ঘুরাইয়া পৃথিবীটা দেখাইয়া দিল।

বলিল, গাঁ'র ষোলো আনা মিত্রিবাড়ীতে এসেছে। আপনার জন্যে বসতে পারছে না। এখনও চান হয় নি আপনার?

দত্ত মহাশয় তাহার পিছন পিছন নদীর ঘাটের দিকে চলিতে চলিতে বলিলেন, বিলের সবটায় তো বান আসে নি! এখনও বিঘে দশেক, হুঁঃ?

—আজ্ঞে, এই তো আসতে আরম্ভ করেছে। কাল সকাল নাগাদ সবটা ডুববে।

রতন দত্ত মহাশয়কে তিষ্ঠাইতে দিল না! নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্নান করাইয়া নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল, মহিন্দির বললে, পাইকেরের পেছু পেছু গেছেন। ভাবলাম, হাটে গিয়েই বা উঠলেন হয় তো!

দত্ত মহাশয় চলিতে চলিতে বলিলেন, হাটে মানে···ইয়ে। তা প্রায় হাটের কাছাকাছিই···হুঁঃ! কিছুতে দিলে না রতন! না দিবার কারণ রতনের অজ্ঞাত নয়। মহেন্দ্রের মুখে মুখে সে

ইতিবৃত্ত সমগ্র গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল।

একটা সুবিধা হইয়া গেল, দত্ত-গৃহিণী যজ্ঞবাড়ীতে। মা একা বাড়ী আগলাইয়া বসিয়া ছিলেন। দত্ত মহাশয় বাক্যবাণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া যখন তিনি মিত্রবাড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন সকলের আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; মিষ্ট পড়িতেছে। দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা গায়েই মাখিলেন না। উঠানের একাংশে গোলার এক পাশে বসিয়া পড়িয়া তিনি বলিলেন, তা হোক, তা হোক। আমাকে এই খানেই তুটো···হুঃ! খাওয়া নিয়ে কথা।

বৃদ্ধ মিত্র মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, সে কি হয় বাবা! তোমার জন্যে ঘরের ভেতরে জায়গা ক'রে দিক। ওরে!

কিন্তু দত্ত মহাশয়ের মনে অভিমানেরও স্থান নাই, অহঙ্কারেরও না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ঘরে মানে···ইয়ে। এই বেশ হবে।

সেইখানেই পরিতোষ সহকারে আহার সারিয়া দত্ত মহাশয় হাত চাটিতে চাটিতে উঠিয়া আসিলেন।

কলিকাতা ফিরিবার গাড়ী রাত্রি তুইটায়। কলিকাতায় পৌঁছায় পৌনে দশটায়। ডাকগাড়ী নয়, প্যাসেঞ্জর। এটায় গেলে দিনের বেলায় দত্ত মহাশয়ের ভাত জোটে না। ষ্টেশন হইতেই আফিস

ছুটিতে হয়। ট্রামে গেলে ছুটাছুটি কমে বটে, কিন্তু দত্ত মহাশয় পারৎপক্ষে ট্রামে-বাসে চড়িতে চান না। ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাঁটিয়া চলিয়া যান।

কিন্তু সে যাক, এখন ট্রেনভাড়ার কি করা যায়? মেমসায়েব তো…হুঁ, এদিকে গৃহিণীও…হুঁ। দত্ত মহাশয় জননীর শরণ লইলেন। মাসের মধ্যে অন্তত দুইবার এই রকম হয়। গৃহিণীর ব্যাঙ্কে যাহা একবার জমা হইয়া যায়, তাহা আর বাহির হয় না। মাকে দুইটা টাকা প্রণামী লইয়া তিনটি টাকা আশীর্ব্বাদী দিতে হয়। সেকেলে মানুষ, হিসাব-নিকাশের জ্ঞান কম। অত ভাবিয়া দেখেন না। শুধু ছেলের হাতে টাকা নাই শুনিয়াই ব্যাকুল হন। এবারেও দত্ত মহাশয়কে তিনটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। রাত্রি একটার সময় বাহির হওয়ার কথা থাকিলে দশটার সময় হইতে গৃহিণীকে তাগাদা দিতে হয়। এই রূপে দত্ত মহাশয় কোনো প্রকারে যথাসময়ে ষ্টেশনে এবং তারপরে আফিসেও পৌঁছিলেন।

আফিসে পৌঁছিয়া একশত আটবার যাবতীয় দেবতার নাম একটা ফাস কাগজে লিখিয়া কপালে ঠেকাইলেন। বেয়ারা হইতে বাবু পর্য্যন্ত যে কেহ আসিল, তাহারই কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞসা করিলেন, এবং অবশেষে একখানা চিঠির খসড়া করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিবানিদ্রা বলিয়া নয়, হাঁটিতে হাঁটিতেও ভদ্রলোক ঘুমাইয়া পড়েন। মাঝে মাঝে লোকের ধাক্কা খাইয়া চমক ভাঙে।

মনের গহনে

এক দফা ঝিমাইয়া লইয়া দত্ত মহাশয় পাশের ঘরের সহকর্ম্মীর খোঁজ লইতে গেলেন। তিনি তো অবাক!

—কি খবর দত্ত? বুড়ো মা···

সহকর্ম্মীর মুখ দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের প্রাণ শুকাইয়া গেল। তার উপর বুড়ো মা! তাঁহার মাথা কলসীর মত দুলিতে লাগিল।

—বুড়ো মা···মানে চিঠিপত্র কিছু এসেছে নাকি?

—কেন? তুমি বাড়ী থেকে আসছ না? ভাল আছেন তো তিনি?

দত্ত মহাশয় জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, ভাল মানে, হাঁ ভালই তো দেখে এলাম।

—তবে তোমার মাথা অমন উস্ক-খুস্ক কেন? পায়ের জুতো কি হ'ল?

দত্ত মহাশয় আশ্বস্ত হইয়া হাসিলেন। বলিলেন, জুতো মানে ···ইয়ে। বাড়ী থেকে যখন বেরুলাম, মনে হ'ল জুতোটা হাতেই আছে। ষ্টেশনে এসে পা ধুতে গিয়ে দেখি, হুঁ। তা হ'লে বাড়ীতেই বোধহয় ··তোমার বাড়ীর খবর ভাল? ছেলেপুলে সব···

—হাঁ ভাল।—বলিয়া ভদ্রলোক কলম তুলিয়া লইলেন। দত্ত মহাশয় খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, তোমার কাছে··· ইয়ে, দুটো টাকা হবে?

মনের গহনে

—টাকা? কি করবে?

মাথা চুলকাইয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, যাওয়ার পথে…হুঁ, জুতো এক জোড়া…

ভদ্রলোক দুটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। দত্ত মহাশয় আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। তারপর আফিসের কাজ আরম্ভ হইল। একটা খসড়া সাতবার কাটেন। অবশেষে সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া লেখেন। সেটা পছন্দ না হইলে আবার কাটেন, আবার লেখেন। এমনি করিয়া যখন খান পাঁচেক খসড়া শেষ হইল, তখন বেয়ারা আসিয়া জানাইল রাত নয়টা বাজে। বাবুর জন্য সে বেচারাও বাড়ী ফিরিতে পারিতেছে না। বাবু উঠিলেই আলো নিবাইরা দিয়া চলিয়া যাইতে পায়।

বাধ্য হইয়া দত্ত মহাশয়কে উঠিতে হইল। কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকী। অগত্যা সে গুলি বাঁধিয়া বাসায় লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন। আফিসে আসিয়া টিফিনের সময় খান দুই পুরী আর একটা সন্দেশ মুখে দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে পেটে আর কিছু পড়ে নাই। কিন্তু সেজন্য বিশেষ অসুবিধা হইতেছে না। উপবাসে তিনি 'সিদ্ধ উদর'—এক আধ বেলা না খাওয়ার কথা মনেও পড়ে না

আফিসের ফাইল বগলে দাবিয়া ছাতা মাথায় দিয়া দত্ত মহাশয় রাস্তায় নামিলেন। রৌদ্র-বৃষ্টি থাকুক আর না থাকুক, দিনেই

হোক অথবা রাত্রেই হোক, ছাতাটি ভদ্রলোকের মাথায় দেওয়াই চাই, এবং এই ছাতাটি-ই। এ তাঁহার বহু কালের অভ্যাস। ছাতাটি মাথায় দিয়া রাস্তায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসা।

বাসায় যখন ফিরিলেন, তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। অবশ্য বাসা একটু দূরেই। হাতিবাগানে। সাধারণ মানুষের তিন কোয়ার্টারের বেশী লাগে না। দত্ত মহাশয়ের দেড় ঘণ্টা।

বাসার সকলে তখন নিদ্রামগ্ন। উড়িয়া ঠাকুর তখনও বাবুর প্রতীক্ষায় একটা পিড়িতে বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া একটা উড়িয়া গান মক্স করিতেছে। সুমুখে বসিয়া চাকরটা বিড়ি মুখে দিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। দত্ত মহাশয় দরজায় উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর সব ভাল তো ঠাকুর ?

চাকরটা বিড়ি পিছনে লুকাইল। ঠাকুর সঙ্গীত বন্ধ করিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া বলিল, আজ্ঞা হাঁ বাবু। ঈশ্বর প্রসাদাৎ খবর ভাল। আপনার খবর ভাল ? বাড়ীর সব মংগল্ ?

দত্ত মহাশয় বাড়ীর চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, বাড়ী মানে...হুঁ।

উপরে আসিয়া ছাতাটি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া একটি কোণে ঠেস দিয়া রাখিলেন। জুতা খুলিতে গিয়া মনে পড়িল জুতা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। আসিবার সময় রাস্তায় এক জোড়া

কিনিয়া লওয়ার কথা ছিল। তাহাও হয় নাই। ভুল হইয়া গিয়াছে। দত্ত মহাশয় আপন মনেই একটা হুঁ দিলেন।

তাঁহার বড় ছেলে এইখানে থাকিয়া কলিকাতার কলেজে পড়ে। গ্রামের আরও দুইটি ছেলে তাঁহার ঘরেই থাকিয়া কলেজে পড়ে। জামা খুলিয়া আলনায় রাখিয়া দত্ত মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলকে একবার দেখিয়া লইলেন। সব কয়টিই আছে, এবং অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। সকলের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কাহারও জ্বর হয় নাই। ভাল বলিয়াই বোধ হইল।

হাত-মুখ ধুইবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,···ইয়ে। আমার জন্যে রুটি হয়েছে তো?

—আজ্ঞা হুঁ।

—তবে আর কি?···ইয়ে। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে তোমরা খেয়ে নাও। আমার···হুঁ। জপ-তপ সেরে খেতে দেরী হবে।

ঠাকুর খাবার বাড়িতে লাগিল। দত্ত মহাশয় হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত মনে জপে বসিলেন।

অনেক রাত্রে দত্ত মহাশয়ের ছেলে উপেনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া দেখে আলো জ্বলিতেছে। দত্ত মহাশয় কুশাসনে বসিয়া গভীর ধ্যানমগ্ন। অর্থাৎ মাথাটা ধীরে ধীরে নামিতে নামিতে একবার গঙ্গাজলের পাত্র স্পর্শ করিতেছে, আবাব উঠিয়া আসিতেছে।

—বাবা, ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

—উঁ !—দত্ত মহাশয়ের চমক ভাঙিল।

—ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

—ঘুম মানে—একটুখানি হুঁ !···ইয়ে—

কোশার গঙ্গাজল লইয়া দত্ত মহাশয় চোখে দিলেন। বলিলেন, তোমরা সবাই ভাল তো ? ক'টা বাজে ?

ঘড়ি দেখিয়া উপেন বলিল. তিনটে পাঁচ।

— তা হলে আর···ইয়ে।—দত্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি নীচে ছুটিলেন।

মহা প্রলয়ের পরে

মনের গহনে

ইহারা অতি নিরীহ লোক। বাক্‌যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো প্রকার যুদ্ধে এ গ্রামের কোনো লোকের অনুরাগ নাই। কথায় কথায় লাঠি ধরিবার দুর্ণাম আছে একমাত্র বংশীধর মণ্ডলের। লোকটা বলশালী নয়। বছরের মধ্যে নয়টা মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া দেহে শুধু হাড় সার হইয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়? যাহারা তেজী লোক তাহাদের তেজ কিছুতে যায় না। বংশীধর তাহার বৃদ্ধা মা এবং চিররুগ্না স্ত্রীর উপর চটিয়া কথায় কথায় এমন চীৎকার করে এবং মাথার উপর সরু তেল-চুক্‌চুকে লাঠিটা এমন ভাবে ঘুরায় যে পাড়ার লোক জুটিয়া যায়। বুড়ী মা মার খাইলেও চেঁচায় না, নিঃশব্দে থর্ থর্ করিয়া কাঁপে। কিন্তু রুগ্না স্ত্রী স্বামী লাঠি ধরিবামাত্র ভাঙা কাঁসরের মত ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া ওঠে এবং স্বামীর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রতি এমন সকল বাক্য প্রয়োগ করে যে তাহা কানে শোনা যায় না।

একমাত্র বংশীধর এই প্রকৃতির লোক। বাকী সকলেই নিজের নিজের সংসারের সহস্র প্রকার অভাব-অভিযোগ লইয়াই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে পাঁচজনে জটলা করিয়া প্রতিবেশীর দুরবস্থা সম্বন্ধে শ্রুতিমধুর আলোচনা করে। কখনও চারি আঙুল জায়গা কিম্বা জমির আলের স্বত্ব লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদও বাধে। তখন দুই পক্ষই সদরে গিয়া এক এক নম্বর ঠুকিয়া আসে, এবং বাকী সকলেই কোন না কোন পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া সত্যের মর্য্যাদা

রক্ষা করে। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা গ্রামের অথবা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করে এবং সকালে-সন্ধ্যায় তাস-দাবা খেলে।

এখানে খবরের কাগজ আসে না। একখানা ঢাউস্ সাপ্তাহিক আসিত, তাহাও কিছুদিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খবরের কাগজের অভাবও কেহ বোধ করে না। চীনের সঙ্গে জাপানের লড়াই বাধিবে কি না, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হওয়া ভালো কি মন্দ, হোয়াইট পেপারে কি দেওয়া হইয়াছে, আর কি দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য ইহাদের মাথা-ব্যথা নাই। এক কথায় ইহারা ধরিয়া রাখিয়াছে সকলের অদৃষ্টে যাহা হইবে, ইহাদেরও তাহাই হইবে। খবরের কাগজ পড়ে না বলিয়া তো আর বেশী হইবে না! তবে আর ব্যয়বাহুল্যের প্রয়োজন কি?

ব্যয়বাহুল্য করে না—খবরের কাগজও পড়ে না। তবে মানুষের মনে সংবাদ-সংগ্রহের যে সনাতন কৌতূহল আছে, তাহা মিটায় ব্রজরাখাল। ব্রজরাখাল কলিকাতায় কি একটা আপিসে কাজ করে—সকাল-সন্ধ্যায় ট্যুইশান আছে। এ সমস্ত সারিয়া এমন সময় থাকে না যে, খবরের কাগজটা একবার উল্টায়। তবে কলিকাতায় থাকিলে মানুষের কানে দুই-চারিটা খবর আসেই। ব্রজরাখাল কুতূহলী জনবৃন্দকে সেই খবর শোনায়। সে খবরের কতক অতিরঞ্জনে বিকৃত, কতক একেবারে মিথ্যা। তা হউক, খবরের কাগজ কেনার অপব্যয়টা তো বাঁচে।

এই সকল নানা কারণে গ্রামের মধ্যে ব্রজরাখালের যথেষ্ট খাতির ছিল।

সেদিন চরণ মাষ্টার খুব ভোরেই গাড় হাতে মাঠে যাইতে ছিলেন। দীঘির ঘাটের কাছে আসিতেই, মনে হইল নৈঋত কোণের বুড়া বটগাছের নীচে দিয়া কে যেন হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে। একে ভোর আছে, তাহার উপর কুয়াশা। চরণ মাষ্টার থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

না, যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন সে রকম কিছু নয়,—ব্রজরাখাল। রাত্রের গাড়ীতে নামিয়া শীতের অন্ধকারে আর বাড়ী আসিতে সাহস করে নাই। রাতটা ষ্টেশনেই কাটাইয়া, ভোর থাকিতে রওনা হইয়াছে।

ব্রজরাখাল দুই হাতের বোঝা দুইটা পথের উপর নামাইয়া ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। চরণ মাষ্টারের সে ছাত্র।

...কি বাবা, ভাল আছ তো?

ব্রজরাখাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভালোই আছে। কিন্তু মাষ্টারের এমন শুষ্ক কণ্ঠ সে কখনও শোনে নাই। উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার শরীরটা কি ভাল নেই স্যার?

বিস্মিতভাবে চরণ মাষ্টার বলিলেন,—ভালোই আছে তো!

কিন্তু তথাপি ব্রজরাখাল সে কথা যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

অকস্মাৎ মাষ্টার মহাশয়ের যেন অসুস্থতার কারণ মনে পড়িয়া গেল। এক গাল হাসিয়া বলিলেন—ও হো! বোধ হয় কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি, সেইজন্যে।

ব্রজরাখাল ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু তখনই হাসি চাপিয়া কহিল,—ঘুম হওয়াই মুস্কিল। যা ভূমিকম্প…

ঘাড় নাড়িয়া মাষ্টার কহিল,—ভূমিকম্প নয়, বাবাজি, কাল সন্ধ্যেয় এককড়ির সঙ্গে এক বাজি দাবায় বসলাম। ও সব আনাড়ির সঙ্গে বড় দাবা তো ধরি না, সে তুমি জানোই। কিন্তু একলা বসে থাকতে কি রকম বিরক্ত লাগছিল। ভাবলাম, হোক গে আনাড়ি, তবু সময় তো কাটবে। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজি, এ দিগরে আমার সঙ্গে দাবা ধরতে কেউ সাহস করে না, আর আমিই উপর্যুপরি তিনবার গেলাম হেরে! দুঃখে সমস্ত রাত চোখের পাতা বুজতে পারলাম না।

দাবা খেলা সম্বন্ধে ব্রজরাখালের উৎসাহ ছিল না। শুধু বলিল,—ও।

এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া চরণ মাষ্টার মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া যেন সমস্ত দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করিয়া ঠেলিয়া বলিলেন—তারপরে, ভূমিকম্পের কথা কি যেন বলছিলে, বাবাজি? পশ্চিমে নাকি…

—সে যা যাবার তা তো গেছেই। এখন আবার যে নতুন বিপদ!

চরণ মাষ্টার একটুতেই বিচলিত হইয়া ওঠেন। গাড়ুটা নামাইয়া পথের উপরেই তিনি বসিয়া পড়িলেন।

—কি রকম? বোসো, বোসো।

ব্রজরাখাল সেইখানেই উবু হইয়া বসিয়া, গম্ভীর ভাবে কহিল,—ইটালী থেকে বড় বড় জ্যোতিষী গণনা করে বলেছেন, বিশে তারিখে নবগ্রহের সঞ্চার হবে। এ রকম সমাবেশ নাকি সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে একবার হয়েছিল, আর হয় নি।

—হুঁ? তাহ'লে?

ব্রজরাখাল মোট দুইটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল,—এবারে আর রক্ষে নেই। যাবে সব আর কি!

চরণ মাষ্টার কথাটি কহিতে পারিলেন না। ব্রজরাখাল যখন মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। মাঠে গেলেন বটে, কিন্তু সে যাওয়ামাত্র। ঘাটে আসিয়া গাড়ু মাজিতে মাজিতে আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

এমন সুন্দর কাকচক্ষুর মতো কালো জল, একুশে তারিখে আর কোনো মানুষের চোখ এই কালো জলের তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে পাইবে না,—হয়তো এইখানে উঠিবে একটা পাহাড়, আর প্রভুর বাড়ীর মন্দিরটা বিরাট জলাশয়ে পরিণত হইবে। কে জানে, এই পৃথিবীর কোনো চিহ্নই থাকিবে কি না! আর কোনোদিন হয়তো ঘটা করিয়া সূর্য্য উঠিবেও না, অস্তও যাইবে না। নবগ্রহের সঞ্চার তো

আর সোজা জিনিস নয়। এক শনির কোপেই অত বড় শ্রীবৎস রাজার কি লাঞ্ছনাই না হইয়াছে! আর এ তো একেবারে নয় নয়টা গ্রহ! এই পৃথিবীর জন্মকালের মধ্যে এমন প্রচণ্ড সমাবেশ একবার মাত্র হইয়াছিল। তার ফলে কুরুক্ষেত্র,—পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় বলিতে আর ছিল না।

গাড়ু মাজিতে মাজিতে গোটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটাই যেন চরণ মাষ্টারের চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল।

ঈশান কোণের বটগাছটার গোড়ায় যেন অর্জ্জুনের রথ, আর ওই রঞ্জাবতীর মাঠে কুরুসৈন্য। মধ্যে চিকণদহের বিল। ও দিকে সারি সারি কাতার দিয়া শূল, মুষল, পরশু, তোমর হাতে কুরুসৈন্য। দেখিলে মনে হয়, কে যেন দেওয়াল দিয়া রঞ্জাবতীকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার, দিবা দ্বিপ্রহরেও সূর্য্য দেখা যায় না, থাকিয়া থাকিয়া রণশঙ্খ বাজিতেছে, অশ্বের হ্রেষায়, হস্তীর বৃংহতিতে, বীরগণের সিংহনাদে ও আস্ফালনে এবং কোটি কোটি মানুষের চীৎকারে পৃথিবীর আর সমস্ত শব্দ কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। রণক্ষেত্রময় বিপুলাকার রণহস্তিগণ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে,—মনে হয় যেন ওদিকে আকুল করিয়া মেঘ উঠিয়াছে। এই ভীমসেন 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' রবে ক্ষেমধূর্ত্তির গজবাহিনীর উপর শার্দ্দুলের মতো লাফাইয়া পড়িলেন,—তাঁহার গদাঘাতে গজবাহিনী বায়ুতাড়িত মেঘের মতো চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এই অশ্বত্থমা গর্জ্জন করিয়া পাণ্ড্যরাজের বাহিনী আক্রমণ করিলেন, —তাঁহার নিশিত কঙ্কপত্রাঙ্কিত শরজালে আকাশ ও প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। মাত্র আঠারোটি দিন,—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মনুষ্য ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল।

এমনি ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র সমর! গ্রহ-নক্ষত্রের তেমনি যোগা-যোগ এতকাল পরে আবার হইয়াছে!

চরণ মাষ্টারের মনে হইল, এতক্ষণ ধরিয়া ঘষিয়া মাজিয়া গাড়ুটিকে দর্পণের মতো পরিষ্কার করার মতো নিরর্থক কাজ আর কিছুই নাই!

কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের দোষও তো দেওয়া যায় না। এদিকে কলি যে চার পোয়া হইয়া উঠিয়াছে!

মদন মিস্ত্রী একটা ভাঙা জানালা মেরামত করার মজুরী বাবদ কয় আনা পয়সা লইয়া কী কথাটাই না শোনাইয়া গেল! মদন মিস্ত্রীর বাবা পাঁচ বৎসরের ব্রাহ্মণ-শিশু দেখিলেও তাহার পায়ের ধূলা লইত। আজ মদন কলিকাতার কোন্ কাঠের দোকানে ষাট টাকা মাহিনায় চাকুরী করিয়া কিছু টাকা জমাইয়াছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে সোনার গহনা উঠিয়াছে। দু' পাঁচ টাকা সুদেও খাটাইতেছে। দেমাকে আর মাটিতে পা পড়ে না। দেবু পরামাণিকও জমিদারের পাইককে লাঠি দেখাইয়া হাঁকাইয়া দেয়! আবার কলি কাহাকে বলে?

মনের গহনে

চরণ মাষ্টার বুঝিলেন, গাড়ু মাজা মিথ্যা। চৈত্র মাসে জল পড়িলেই ঘর ছাওয়াইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কয়েকজন ছাত্রের কাছে কিছু খড়ের প্রতিশ্রুতিও পাইয়াছিলেন। কিছু খড় তাঁহার নিজেরও আছে। চরণ মাষ্টার একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। যাক্, আর ঘর ছাওয়াইবার দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে না।

সকালে তাঁহার কাছে কয়টি ছাত্র পড়িতে আসে। বৈঠকখানার দাওয়ায় বসিয়া তাহারা এতক্ষণ হুটোপাটি করিতেছিল। মাষ্টারের মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পড়িতেই শশব্যস্তে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া পড়া মুখস্থ করিতে বসিল। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ মাষ্টার একবার তাহাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে চাহিলেন, কিন্তু তখনই দৃষ্টি সংযত করিয়া লইলেন।

—স্যার, মধু কন্‌ষ্টান্টিনোপল্‌কে বলছে কন্‌টিনোপল্‌।

মাষ্টার সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। কাল ২১শে। এই একটা দিন কন্‌ষ্টান্টিনোপল্ হয় তো হউক। একুশের পর কন্‌ষ্টান্টি-নোপ্‌লে আর কলিকাতাতে কোনো প্রভেদই থাকিবে না। চরণ মাষ্টার সবিস্ময়ে ভাবিলেন, এত দিন ধরিয়া নিজে যে এত পাশের পড়া মুখস্থ করিলেন, এবং এত ছেলেকে পড়া তৈরী না করার জন্য এত নির্য্যাতন করিলেন, সে কিসের জন্য? পরশু হইতে যুগ যুগান্তরের বহু জ্ঞানী ও গুণীর সংগৃহীত, বহুকালের তপস্যালব্ধ

জ্ঞানের কি মূল্য থাকিবে? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মানুষ আপনার দেহপাত করিয়াছে। ভাবিয়াছে দেহ যায় যাক, তাহাদের স্মৃতি মানুষের মনে অমর হইয়া থাকিবে। সেই স্মৃতিরও এই পরিণতি!

ছেলেরা পড়িতেছিল, ১৭৫৬ সালে ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করেন। ৫৬ নয় ৫৭। অন্য সময় হইলে মাষ্টার আস্ত একগাছা বেত ছাত্রের পিঠে ভাঙিতেন। কিন্তু আজ আর কিছুই করিলেন না। ৫৬ই সই। কালকের পরে এই পৃথিবী,—অর্থাৎ যাহাকে আমরা পৃথিবী বলি,—কতকগুলি নেব্যুলার সমষ্টি অথবা অন্য কোনো কিছুর সমষ্টি হইবে,—এই পৃথিবী নামধারী গ্রহ এক মুহূর্তে মহাকালের শাসন অতিক্রম করিবে। তখন আর ১৭৫৭'র সঙ্গে ১৮৫৭'র কোনোই ব্যবধান থাকিবে না।

—ক্লাইভ, ক্লাইভ, ক্লাইভ···

ছেলেরা ক্লাইভ নামটাকে মুখস্থ করিতেছে! একজন লোক পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে। তাহার নাম ক্লাইভ না হইয়া রবার্টসন্ হইলেই বা কি আসে যায়! কে বলিল ক্লাইভ যুদ্ধ-জয় করিয়াছে? কে বলিতে পারে, যে অজ্ঞাতনামা লোকটার তোপে মীরমদন আহত হয়, যুদ্ধের জয়ফল তাহারই প্রাপ্য নয়? অথবা অপর কোনো নিম্নতম সৈনিকের একটা চালের ফলে যে যুদ্ধ জয় হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

মাষ্টার এক ধমক দিয়া বলিলেন,—কে ব'ললে ক্লাইভ যুদ্ধ-জয় করেছে ?

—তবে ?

—অন্য লোক। পরশু সকালে আসিস্, তার নাম ব'লে দোব।

—স্যার, পরশু সকালে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি বেঁচে বর্ত্তে থাকিস্।

একুশে তারিখে চরণ মাষ্টার আর স্কুলে গেলেন না। আর স্কুলে যাওয়া ! একখানা ছুটির দরখাস্ত করারও প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

সকাল-সকাল স্নান সারিয়া একটু জপে বসিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। এমন সময় ডাক আসিল,—

—চরণ আছ না কি ?

এককড়ি ! দাবার পুঁটুলিটি হাতে ঝোলানো।

চরণ মাষ্টার একটু হাসিলেন। একদিন জিতিয়া লোকটার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। বলিলেন,

—চলো, আমি বাইরের ঘর খুলে দিচ্ছি।

বাহিরের ঘর খুলিয়া দিয়া চরণ তাহাকে জায়গা পাতিয়া বসাইলেন। দাবার বলগুলি সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন,

—তোমাদের সঙ্গে দাবা খেলতে বসাই বিপদ, এককড়ি। জিতলে নাম নেই, হারলে সর্ব্বনাশ।

মনের গহনে

স্মুখের দুইটা বোড়ে টিপিয়া এককড়ি বলিল,

—আগে ভয়ে তোমার সঙ্গে দাবা ধরতাম না মাষ্টার,—ভাবতাম তোমারা কী-না-কী। তারপরে দেখলাম, ও মা!

প্রত্যুত্তরে চরণ শুধু একটু হাসিলেন, এবং সামান্য দুই একটা চালের পরই এককড়ির কয়েকটা বল টুক টুক করিয়া মারিয়া আবার একবার হাসিলেন। চরণ মাষ্টার সত্যই ভালো দাবা খেলেন। এককড়ি তাঁহার কাছে নিতান্তই শিশু। তাহার রাজা চরণের বলগুলির চাপে অসহায় অবস্থায় এঘর হইতে ওঘরে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার বলের চাপ মন্দীভূত হইয়া পড়িল। মনে হইল, চরণ মাষ্টার কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন। খড়ের চাল হয়তো কোথাও একটু মচ্ মচ্ করিতেছে, কোনো কারণে দরজার কপাট হয়তো একটু নড়িতেছে, পাশের ঘরে টিনে মুড়ি আছে, ইঁদুরে হয়তো সেখানে ঠুক্ করিয়া একটু শব্দ করিতেছে,—অমনি চরণ মাষ্টার চমকিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। এমনি অবস্থায় তাঁহার মন্ত্রী বেঘোরে প্রাণ হারাইল। চরণ মাষ্টার সচকিত হইয়া আবার ভালো করিয়া বসিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ মনোযোগ দিবার সাধ্য কি? আকাশে অল্প অল্প করিয়া বেশ মেঘ উঠিল। সে মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। এইবার বৃষ্টি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়, তার সঙ্গে···

এককড়ি নৌকার একটা কিস্তি দিয়া হাকিল,

—মাৎ !

চরণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, এককড়ির তিন চারিটি বল রাজার সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে, নড়িবার উপায় নাই। কিন্তু চরণ তাহাতে দুঃখিত হইলেন বলিয়া মনে হইল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

—দুর্যোগটা বোধ করি বিকেলের দিকেই লাগবে এককড়ি। কি বল ?

এককড়ি দবার গুটিগুলি থলির মধ্যে পুরিতে পুরিতে বলিল,

—হাঁ, দুর্যোগ না আরও কিছু ! তোমার যেমন কাণ্ড।

চরণ চোখ কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,

—বল কি হে ! পণ্ডিতে গণনা করে বলেছে যে !

—বলুক গে। পণ্ডিতে বললেই অমনি মুহূর্তে বাড়ীঘর ছেড়ে মাঠে পালাবে নাকি ?

চরণ কথা বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল, এককড়ির নাস্তিকতায় তিনি বিরক্ত হইয়াছেন।

দুপুরে মাষ্টার আর দিবানিদ্রার জন্য উপরে গেলেন না। একখানি কম্বল বিছাইয়া বৈঠকখানার দাওয়াতেই শয়ন করিলেন। বাড়ীতে মেয়েরা এইজন্য তাঁহাকে কত ঠাট্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি সে সব গায়ে মাখিলেন না ! মাটি নড়িলেই তিনি লাফাইয়া রাস্তায় নামিবেন।

এদিকে কয়দিন হইতে তাঁহার কি যে হইয়াছে, চোখ বন্ধ করিলেই মনে হয় পৃথিবী টলিতেছে, দেওয়াল নড়িতেছে, চারিদিকের সমস্ত কিছু ঘুরিতেছে। চরণ মাষ্টারের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছে, অথচ নিদ্রার উপায় নাই। হঠাৎ নজরে পড়িল, ওপাড়ার একটি ছেলে তাঁহাকে দেখিয়াই পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে। মাষ্টার তাহাকে ডাকিলেন,

—এই, শোন্।

ছেলেটি কাঁপিতে-কাঁপিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে স্কুল কামাই করিয়া পাখীর ছানা পাড়িবার জন্য এদিকে আসিতেছিল। চরণ মাষ্টার যে স্কুলে না গিয়া এইখানে বসিয়া আছেন, তাহা সে ভাবে নাই।

—কোথা যাচ্ছিস্?

—আজ্ঞে···

চরণ মাষ্টার বুঝিলেন, ছেলেটি বিনা কাজেই ঘুরিতেছে। বলিলেন,

—এইখানে বোস্। আমি একটু ঘুমুবো। ভূমিকম্প আরম্ভ হ'লেই ডেকে দিস্। বুঝলি?

কিন্তু তথাপি ঘুম হয় না। তাঁহার দেহের যন্ত্রপাতি যেন বিকল হইয়া গিয়াছে। লোকে কথা কহিলে শুনিতে পান না, কিন্তু কপাটের শিকল ঠুক্ করিলে ঘুম হইতে লাফাইয়া ওঠেন। ছেলেটি

যে মাষ্টারের কাছে প্রহার খাইল না, ইহাতেই কৃতার্থ হইয়া গেল। সে পাশেই একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রলয়ের কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। ভয় সকলেরই হইয়াছে, কিন্তু চরণ মাষ্টারের মতো এমন কেহ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে চরণ মাষ্টারের ভয়ের কথাটাও চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থা উঁকি-ঝুঁকি দিয়া দেখিয়া দেখিয়া যায়।

দেখিবে আর কি? বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় একখানা দেহ আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

চরণ মাষ্টার মনে মনে ভগবানের নাম করিতেছিলেন। প্রলয় সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ নাই। ভাবনা হইয়াছে তাহার পরের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া। ভগবানে তাঁহার কোনো কালে বিশ্বাস ছিল না। আত্মা, পরলোক, পুনর্জ্জন্ম এ সবও মানিতেন না। কিন্তু এখন মনে হইল, আছে বই কি, সবই আছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরে এই পৃথিবীর কোন চিহ্নই থাকিবে না, তাঁহার দেহেরও না। কিন্তু আত্মাই হউক, আর যাহাই হউক, সত্যকার যে তিনি, তাহার জন্য তারপরেও তো একটা আশ্রয় চাই। প্রাণপণে ভগবানকে তখনকার একটা অবস্থা করিবার জন্য চরণ মাষ্টার সকাতরে ডাকিতে লাগিলেন, এবং কখন একটুখানি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এককড়ি পান চিবাইতে চিবাইতে দাবায় পুঁটুলিটি হাতে

করিয়া এইদিকে আসিতেছিল। আশে পাশে কৌতূহলী জনতা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চরণ মাষ্টারের অবস্থা দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, ছেলেরাও সহাস্যে নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করিতেছিল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া এককড়ির পরিহাস-প্রবৃত্তি উদ্যত হইয়া উঠিল। সে একটা মস্তবড় ইঁট দুম্ করিয়া দরজা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। দরজার কাঠে লাগিয়া ভীষণ শব্দ হইল, শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, আর চরণ মাষ্টার 'বাপ্' বলিয়া শব্দ করিয়া জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় ছিট্‌কাইয়া রাস্তায় পড়িলেন, আর উঠিলেন না।

সে রাত্রে কী দুর্য্যোগই না গেল! বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া সমস্ত রাত বৃষ্টির আর বিরাম নাই। চরণকে ধরাধরি করিয়া সকলে বাহিরের ঘরে আনিয়া শোয়াইয়াছে। রাত্রি বারোটার সময় তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন। চাহিলেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো ঘোলাটে। ডাকিলেও সাড়া নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল, যা কিছু তিনি দেখিতেছেন সবই মিথ্যা, শাস্ত্রে যাহাকে বলে মায়া। এ সব পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি! সদু পিসি চেঁচাইয়া আর উপস্থিত সকলকে ফরমাস করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী কোলের ছেলেটিকে কাপড় ঢাকা দিয়া স্তন্য দিতেছেন আর অঝোরে কাঁদিতেছেন, কয়েকটা ছেলে শিয়রের কাছে বসিয়া মাথায় জল দিতেছে আর হু হু শব্দে পাখা করিতেছে, ঘরে ও বাহিরে

বহু লোক কলরব করিতেছে—চরণ মাষ্টারের মনে হইল, এ সবই মায়া, চোখের ভুল। সত্য শুধু বাহিরের ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির শব্দ। সে তো বৃষ্টির শব্দ নয়, মহাপ্রলয়ের কল্লোল গীত। তিনি আবার চোখ বন্ধ করিলেন।

অবশেষে ভোরের দিকে তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তিনি উঁচু হইয়া বালিশে ঠেস দিয়া বসিলেন। পাড়ার লোকেরা কেহ বা সহানুভূতি জানাইতে লাগিল, কেহ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল; স্বামীকে উঠিতে দেখিয়া গৃহিণী নিশ্চিন্ত মনে গৃহ কর্ম্মের জন্য রান্না ঘরে গেলেন।

এ কি! রান্নাঘরের দরজা খোলা কেন? গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গো!

চরণ মাষ্টার লাফাইয়া উঠিলেন,—আবার কি!

লোকজন ছুটিয়া ভিতরে আসিল।

সর্ব্বনাশই বটে! বাসন বলিতে একখানি নাই। এমন কি ভাতগুলি ঢালিয়া রাখিয়া পিতলের ভাতের হাড়িটি পর্য্যন্ত কে লইয়া গিয়াছে।

মহাপ্রলয়ের পরে চরণ মাষ্টার রান্নাঘরের দাওয়ার উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।